হাকিকাত কিতাব প্রকাশনী : ১

ঈমান ও ইসলাম

(ইতিক্বাদ নামা পুস্তকের অনুবাদ)

লেখক
মাওলানা জিয়াউদ্দিন খালিদ আল বাগদাদী

আল্লামা হুসাইন হিলমী
ইশিক(র.)

হাকিকাত কিতাব প্রকাশনী : ১

ঈমান ও ইসলাম

(ইতিক্বাদ নামা পুস্তকের অনুবাদ)

লেখক

মাওলানা জিয়াউদ্দিন খালিদ আল বাগদাদী

(আল্লাহ তায়ালার রহমতপ্রাপ্ত বিখ্যাত আলেম, যিনি সকল ক্ষেত্রে কামেল, ধর্মীয় ব্যাপারে যার অসাধারন জ্ঞান, ন্যায় বিচারের ক্ষমতা রয়েছে এবং যিনি সত্য পরায়ন)

আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশিক (র.)

লেখক পরিচিতি:

প্রিয় পাঠক,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ|

ইতিক্বাদ নামা কিতাবের লেখক মাওলানা জিয়াউদ্দিন খালিদ আল বাগদাদী আল উসমানী কুদ্দিসা সিররুহু ১১৯২ হিজরি/১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের উত্তরে শাহরাজুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪২ হিজরি/১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে আল উসমানী বলা হয়, কারণ তিনি তৃতীয় খালিফা হযরত উসমান যুননুরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর। তিনি তার ছোট ভাই হযরত মাওলানা মাহমুদ সাহিবকে আল্লামা আন নাববী এর **আল আহাদিস আল আরবাঊন** কিতাবটির দ্বিতীয় বিখ্যাত **হাদিস আল জিব্রিল** শিক্ষা দেয়ার সময় হযরত সাহিব তার বড় ভাইকে এটির ব্যাখ্যা লিখতে অনুরোধ করেন। মাওলানা খালিদ তার ভাইয়ের পুলকিত হৃদয়ে শান্তি প্রদানের জন্য তার অনুরোধ গ্রহণ করেন এবং হাদিসটির ব্যাখ্যায় **ইতিক্বাদ নামা** নামে ফার্সি ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করেন। এটির টার্কিশ সংস্করণ **ঈমান ভি ইসলাম** (Iman ve Islam), ইংরেজী সংস্করণ **বিলিফ অ্যান্ড ইসলাম** (Belief and Islam), আরবী সংস্করণ **আল ঈমান ওয়াল ইসলাম** (Al iman wal Islam), ফ্রেঞ্চ সংস্করণ **ফই এত ইসলাম** (Foi et Islam), জার্মান সংস্করণ **গ্লাউব উন্দ ইসলাম** (Glaube und Islam), উর্দূ সংস্করণ **হারকিসি কেলিয়ে লাযিম ঈমান** এবং পরবর্তীতে অন্যান্য ভাষা যেমন তামিল, ইয়রুবা, হাওসা, মালায়ালাম, ডেনিশ প্রভৃতি ভাষায় বইটির অনুবাদ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা নিষ্পাপ

তরুণদেরকে এই পুস্তক পড়া এবং সঠিকভাবে ইতিক্বাদ বোঝার তৌফিক দান করুন যা আহলে সুন্নাহর আলেমরা আলোচনা করেছেন।

প্রকাশকের কথা:

যদি কেউ কিতাবটির সঠিকভাবে অন্য ভাষায় অনুবাদ কিংবা যথাযথভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করেন, এতে আমাদের অনুমতির কোনই প্রয়োজন নেই। যারা এ মহৎ কাজে আমাদের সাহায্য করছেন তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে রহমত প্রার্থনা করছি, আমাদের শুভকামনা এবং ধন্যবাদ তাদের জন্য। যাই হোক, অনুমতি এই শর্তে দেয়া হচ্ছে যে অনুবাদ সঠিক ও যথাযথ হতে হবে, প্রকাশনা অবশ্যই উন্নতমানের হতে হবে এবং লেখার নকশা, ধারাবিন্যাস সঠিক নিখুত, পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল হতে হবে।

দ্রষ্টব্য: মিশনারিরা খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার করছে, ইহুদিরা তাদের ইহুদি রাব্বিস এর ধারণা ছড়ানোর জন্য কাজ করছে আর ফ্রিম্যাসনরা চেষ্টা করছে সকল ধর্মের অবসান ঘটাতে। ইস্তানবুলের **হাক্বিক্বত কিতাবেভি** মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছানোর কাজ করছে। একজন বিজ্ঞ, জ্ঞানী এবং সচেতন মানুষ বুঝতে পারবে এসবের মধ্যে কোনটি সঠিক এবং তা মানবতার কাছে পৌঁছানোর জন্য সাহায্য করবেন। এটির চেয়ে ভালো এবং মূল্যবান কোন পন্থা নেই মানবতার সাহায্য করার জন্য।

আমরা এই কিতাবের সমস্ত লেখা সংগ্রহ করেছি ইসলামি আলেমদের কিতাব থেকে। আমরা আমাদের নিজ থেকে কোন কিছু যুক্ত করিনি। আমাদের মূল লক্ষ্য, আমাদের বিশ্বাস এবং ইসলাম শিক্ষা দেয়া, আমরা এই কাজটি শুধুমাত্র মানবতার সেবার জন্য করেছি এবং যারা মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেন এবং মানুষের অধিকার রক্ষা করেন তাদের স্বীকৃতির জন্য। আপনি যখন এসব বিখ্যাত লেখকের লেখা মনোযোগ সহকারে এবং গুরুত্বের সাথে পড়বেন, আপনি অনেক বাস্তব এবং ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করবেন ইন-শা-আল্লাহ। আপনার প্রতি আমাদের সালাম ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু দান করুন। আমীন।

আল্লাহুম্মা সাল্লিয়ালা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আলিহি মুহাম্মাদ ওয়া বারিক আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলী মুহাম্মাদ| আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আজাবান্নার, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন| আমীন|

সুবহানাল্লাহি ওয়াবি-হামদিহি সুবহানাল্লাহিল-আজিম'| এই 'কালিমা-ই তানজিহ' সকাল সন্ধ্যা একশত বার করে পাঠ করলে গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। **মাকতুবাত কিতাবের** তুর্কি সংস্করণে ৩০৭ এবং ৩১৮ নম্বর পত্রে এই দোয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি লিখেছেন বিখ্যাত ওলী এবং আলেম ইমাম রাব্বানি কুদ্দিসা সিররুহু| ইয়া রহমান, ইয়া রাহিম, ইয়া আফুয়া ইয়া কারিম|

হাকিকাত কিতাবেভি
ফাতিহ,ইস্তানবুল, তুরুস্ক

প্রাককথনঃ

বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করলাম কিতাব,
ঐ আল্লাহ্’র নামে, যিনি সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল।
যার নিয়ামতের হয়না কোন হিসাব,
এমন রব, যিনি করুণাময় ও ক্ষমাশীল।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকেই করুণা করেন| বান্দার যা যা চাহিদা তা সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেকের নিকট প্রেরণ করেন| দুনিয়াতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, শান্তিতে বসবাসের জন্য এবং আখিরাতে চির সৌভাগ্য অর্জনের জন্য বান্দার কি করা আবশ্যক তাও স্পষ্টভাবে অবহিত করেন| নাফসের, অসৎ সঙ্গের, ভ্রান্ত কিতাব ও বিদেশী মিডিয়ার দ্বারা প্রতারিত বা প্ররোচিত হয়ে সৌভাগ্যের পথ থেকে আলাদা হয়ে যারা কুফর ও ভ্রষ্টতার পথে পতিত হওয়ার পর, এর জন্য অনুশোচিত ও লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকে তিনি হেদায়েত নসীব করেন, সঠিক পথের দিশা দেন, তাদেরকে চিরন্তন বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন| তবে সীমা লঙ্ঘনকারী ও জালিমদেরকে তিনি এই নিয়ামত প্রদান করেন না| তারা নিজ ইচ্ছায় যে অবিশ্বাসের গর্তে পতিত হয়েছে আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে সেখানেই পরিত্যাগ করেন| আখিরাতে যে সকল মুমিনের কৃত পাপের জন্য জাহান্নামে যাওয়া আবশ্যক হবে, তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি অনুগ্রহ করে, ক্ষমা করে, জান্নাতে প্রবেশ করাবেন| সমস্ত জীবের সৃষ্টিকারী, সকল অস্তিত্ববানকে সর্বক্ষণ তাদের অস্তিত্বে অধিষ্ঠিতকারী ও সমস্ত কিছুকে ভয়-ভীতি থেকে রক্ষাকারী একমাত্র তিনিই| এমন আল্লাহ্’র সম্মানিত নামের আশ্রয় নিয়ে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে এই কিতাব রচনা আরম্ভ করছি|

আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি| তাঁর প্রিয় পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করছি| ঐ সম্মানিত পয়গম্বরের পবিত্র আহলে বাইতের

সদস্যদের এবং তাঁর ন্যায় পরায়ণ ও সত্যবাদী আসহাবে কেরামের প্রত্যেকের জন্য কল্যাণের দোয়া করছি|

যাবতীয় নিয়ামত আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি করে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন- তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ঘোষণা করাকে 'হামদ' বলা হয়| আর সমস্ত নিয়ামতকে ইসলামের অনুমোদিত পন্থায় ব্যবহার বা ভোগ করাকে 'শুকর্' বলা হয়|

ইসলামী বিশ্বাসের বিষয়সমূহ এবং আদেশ ও নিষেধসমূহকে অবগত করার জন্য হাজার হাজার মূল্যবান কিতাব রচিত হয়েছে| এগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়েছে| অন্য দিকে, স্বল্প ও ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, ভণ্ড আলেম, জাহিল দ্বীনদার (জিন্দিক) কিংবা বৃটিশ গোয়েন্দাদের দ্বারা প্রতারিত আলেমরা সর্বদাই ইসলামের উপকারী, বরকতময় ও আলোকিত আহকামসমূহকে অর্থাৎ আদেশ ও নিষেধসমূহকে আক্রমণ করে আসছে| তারা ইসলামের উপর কালিমা লেপন করতে, শরীয়তের বিধানাবলি পরিবর্তনে ও মুসলমানদেরকে প্রতারিত করতে সর্বদাই স্বচেষ্ট রয়েছে|

যাইহোক, বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে, ইসলামের আলেমগণ দুনিয়ার সর্বত্র, ইসলামের সঠিক আকীদাকে প্রচার-প্রসারে ও রক্ষা করতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন| ইসলামী ইতিক্বাদের উপর আগত আক্রমণকে প্রতিহত করতে সর্বদা স্বচেষ্ট আছেন| তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি| ইসলামকে আসহাবে কিরামদের কাছ থেকে শুনে শুনে, শিখে কিতাবে লিপিবদ্ধকারী সঠিক পথের আলেমদেরকে **আহলে সুন্নাহর আলেম** বলা হয়| অন্যদিকে, আহলে সুন্নাত আলেমদের রচিত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেনি কিংবা বুঝতে পারেনি এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি, কুরআন করীম ও হাদিস শরীফ থেকে মনগড়া ব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিচ্ছে| এ ধরণের বক্তব্য মুসলমানদের দৃঢ় ঈমানের সামনে বিলীন হতে বাধ্য| এর দ্বারা মূলত বক্তার দ্বীনী ইলমের দৈন্যতা প্রকাশ পায়|

নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে অথবা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে দেখা যায় এমন ব্যক্তিকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হয়| এরপর ঐ ব্যক্তির কোন কথায়, লেখায় বা আচরণে, আহলে সুন্নাত আলেমদের দ্বারা অবহিত করা ঈমানের জ্ঞানের সাথে বিরোধপূর্ণ কিছু প্রকাশ পেলে, তাকে ঐ কথা বা আচরণের কুফর কিংবা দালালাত হওয়ার বিষয়টি বুঝানো উচিত| ঐ আচরণ ত্যাগ করে তওবা করতে বলা উচিত| এরপরও নিজের সীমিত জ্ঞান ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার দ্বারা নিজের কথা বা আচরণের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তা থেকে সরে না আসলে বুঝতে হবে, সে পথভ্রষ্ট অথবা মুরতাদ হয়েছে কিংবা ইংরেজ কাফেরদের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে| এমতাবস্থায় সে যতই নামাজ পড়ুক, হজ্জ আদায় করুক, যতই ইবাদত করুক বা ভালো কাজ করুক, নিজেকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না| কুফরের কারণ হিসেবে বিবেচিত কথা, কর্ম বা বিশ্বাস থেকে নিজেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত, তা থেকে তওবা না করা পর্যন্ত মুসলমান হিসেবে বিবেচিত হবে না| এজন্য প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত, কুফরের কারণ হয় এমন বিষয়গুলিকে ভালভাবে রপ্ত করা এবং তা মেনে নিজেকে মুরতাদ হওয়া থেকে রক্ষা করা| একই সা থে কাফিরদের এবং মুসলমানরূপী পথভ্রষ্টদের ও ইংরেজ গোয়েন্দাদের সঠিকভাবে চিনে তাদের ক্ষতি থেকে নিজেরদেরকে বাঁচিয়ে রাখা|

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, পবিত্র কুরআন করীম ও হাদিস শরীফ থেকে মনগড়া অর্থ ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেয়া হবে এবং এর দ্বারা বাহাত্তর ধরণের ভ্রষ্ট মুসলমান ফিরকার উৎপত্তি হবে। **বুখারী** ও **মুসলিম** শরীফ এর উদ্‌ধৃতিতে '**বারিকা**' ও '**হাদিকা** 'নামক কিতাবদ্বয়ে এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা করা হয়েছে| নিজেদেরকে ইসলামের বড় মাপের আলেম বা দ্বীনী বিষয়ের প্রফেসর হিসেবে জাহির করা ঐসব ভ্রান্ত ফিরকার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের কিতাব, প্রবন্ধ, বক্তব্য বা কনফারেন্সের দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নয়| দ্বীন-ঈমান ধ্বংসকারী এই ধরনের বাতিল ফিরকার ফাঁদে পা না দেয়ার জন্য আমাদের খুবই সতর্ক হওয়া উচিত| এই জাহিল মুসলমানরা ছাড়াও কম্যুনিস্ট, ফ্রিম্যাসন ও খ্রিষ্টান মিশনারিরা এক দিক

থেকে ও ইংরেজদের কাছে নিজেদেরকে বিকিয়ে দেয়া ওহাবীদের সাথে যায়নবাদী ইয়াহুদীরা অন্যদিক থেকে নিত্য নতুন উপায়ে মুসলমান প্রজন্মকে প্রতারিত করতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে| তারা মনগড়া লিখনী, নাটক, সিনেমা, রেডিও-টিভি অনুষ্ঠান ও ওয়েব সাইট ইত্যাদির দ্বারা ঈমান ও ইসলামকে বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে| এ উদ্দেশ্যে তারা বিপুল পরিমাণে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছে| ইসলামের প্রকৃত আলেমগণ রাহিমাহুমুল্লাহু তায়ালা এদের প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় জবাব আগে থেকেই লিখে গেছেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত দ্বীনকে চিনিয়ে দিয়েছেন।

এসকল প্রকৃত ইসলামিক আলেমদের মধ্য হতে বিখ্যাত আলেম মাওলানা খালিদ বাগদাদী উসমানী (কুদ্দিসা সিররুহু) এর **ইতিক্বাদনামা** নামক কিতাবটি নির্বাচন করেছি। এই কিতাবটি মরহুম ফয়জুল্লাহ এফেন্দী কর্তৃক তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়ে '**ফারাইদুল ফাওয়াইদ**' নামে ১৩১২ হিজরীতে মিসরে ছাপা হয়েছে| ঐ অনুবাদকে চলতি ভাষায় রূপান্তর করে' ঈমান ও ইসলাম' নামে ১৯৬৬ সালে 'হাক্কিক্বত কিতাবেভি (প্রকাশনা) থেকে প্রকাশ করেছি| আমাদের ব্যাখ্যাকে মূল কিতাব থেকে আলাদা করার জন্য এই বন্ধনী [ ]'র ব্যবহার করেছি| এই কিতাবটি প্রকাশ করা নসীব হওয়ায়, আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি| ফারসী ভাষার মূল কিতাবটি ইস্তানবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 'ইবনুল আমীন মাহমুদ কামাল বেগ' নামক অংশে '**ইতিক্বাদনামা**' নামে F. 2639 নম্বরে রয়েছে|

'**দুররুল মুখতার** ' কিতাবের লেখক আলাউদ্দীন হাস্কাফি রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা, কাফিরের নিকাহ অধ্যায়ের শেষে বলেছেন, "বিবাহিত মুসলিম বালিকা বালিগা হওয়ার সময় ঈমানের শর্তসমূহ না জেনে থাকলে, নিকাহ ফাসিদ হয়| (অর্থাৎ, সে মুরতাদ হয়ে যায়)। এ জন্য তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সিফাতসমূহ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া উচিত| আর তার উচিত এগুলি শিখে, বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করা"| ইবনে আবেদীন রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা এই বিষয়ের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "কন্যা ছোট অবস্থায় তার মা-বাবার অনুসারী হিসেবে মুসলমান থাকে| কিন্তু

বালিগা হওয়ার সময় সে আর মা-বাবার অনুসারী হিসেবে বিবেচিত হয় না| ইসলাম না জেনে বালিগা হলে মুরতাদ হয়ে যায়| মুসলিম হওয়ার জন্য আবশ্যক ঈমানের মৌলিক ছয়টি বিষয় শিখে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত শুধুমাত্র **কালিমা-ই-তাওহীদ** তথা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লাহ**' মুখে বললেও মুসলমানিত্ব বজায় থাকবে না| **আমানতুবিল্লাহি** ...' তে উল্লেখ করা ছয়টি বিষয়কে শিখে বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁকে বলতে হবে 'আমি আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ ও নিষেধসমূহকে মেনে নিয়েছি'|" ইবনে আবেদীন (রঃ) এর এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, কোন কাফির শুধু মাত্র কালিমা-ই তাওহীদ বললে এবং এর অর্থ বুঝে বিশ্বাস করলে ঐমুহূর্তেই মুসলমান হয়ে যায়| এরপর প্রত্যেক মুসলমানের মত তার উপরও সামর্থ্য অনুযায়ী, **'আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরী ওয়াবিল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তায়ালা ওয়াল বা'সু বা'দাল মাউতি হাককুন আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'** বলে ঈমানের এই ছয়টি মৌলিক বিষয়কে অর্থসহ ভাল করে বুঝে মুখস্ত করা এবং নিজের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইসলামের যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক| কোন মুসলমান শিশুও যদি এই ছয়টি বিষয় ও ইসলামের আহকামসমূহ না শিখে ও স্বীকার না করে, আর ঐ অবস্থায় আকেল ও বালেগ হয় তবে সে মুরতাদে পরিণত হয়| ঈমান গ্রহণের সাথে সাথে **ইসলামের আহকামসমূহ** অর্থাৎ **ফরজ**সমূহ, **হারাম**সমূহ, অজু-গোসল ও নামাজ আদায়ের নিয়মসমূহ, সতরের স্থান ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে শিখে নেয়া তার জন্য **ফরজ**| যাকে এসব ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে তার উপরও সঠিকভাবে শিক্ষা দেয়া বা সঠিক দ্বীনী কিতাবের সন্ধান দেয়া ফরজ হয়| যদি জিজ্ঞাসা করার মতো কোনো ব্যক্তি বা সঠিক কোনো কিতাব পাওয়া না যায়, তবে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা ফরজ। অনুসন্ধান না করলে কাফির হয়ে যাবে| সন্ধান পাওয়ার আগ পর্যন্ত এই বিষয়গুলি না জানা উজর হিসেবে গণ্য হবে| যদি কোন বাক্তি নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ কাজ আদায় না করে এবং/অথবা কোনো হারাম কাজ করে, তবে এই কাজের জন্য তাকে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে। **ইমান এবং**

ইসলাম কিতাবটি ঈমানের এই ছয়টি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছে| প্রত্যেক মুসলিমের এই কিতাবটি ভালভাবে পড়া উচিত, তার সন্তানদের পড়ানো উচিত এবং পরিচিতদের এটি পড়তে উৎসাহিত করা উচিত|

এই কিতাবে আয়াতে করীমার অর্থ **মাল** (মুফাসসির কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে| কেননা আয়াতে করীমার প্রকৃত অর্থ শুধু মাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতেন এবং তিনি হাদিসে তা আসহাবে কিরামকে অবহিত করেছেন| প্রকৃত মুফাসসিরগণ, এই হাদিস শরীফগুলিকে মুনাফিক ও ইংরেজ কাফিরদের নিকট বিক্রি হয়ে যাওয়া ভ্রান্ত জিনদিক্ ও লা-মাজহাবী আলেমদের দ্বারা জালকৃত হাদিস থেকে আলাদা করে গেছেন| যেসব বিষয়ে হাদিস শরীফ বর্ণিত হয়নি, সেক্ষেত্রে তাফসীরের কায়দা অনুসরণ করে নিজেরা সেসব আয়াতের অর্থ প্রদান করেছেন| আরবী জানে, কিন্তু ইসলামের কায়দা-কানুন জানেনা ও তাফসীরের ইলম নেই, এমন জাহিলদের দেয়া ব্যাখ্যাকে **কুরআনের তাফসীর** বলা হয় না| প্রকৃতপক্ষে, হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, **"যে ব্যক্তি কুরআন করীমের নিজের মনগড়া অর্থ প্রদান করে, সে কাফির"**|

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবাইকে আহলে সুন্নাহর আলেমদের দ্বারা প্রদর্শিত সঠিক পথে অবিচল থাকার তৌফিক দিক| ইসলাম বিষয়ে অজ্ঞ, মাজহাব বিরোধী ও 'ইসলামের মহান সাধক' নামধারী মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা প্রচারণায় বিশ্বাস করা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুক! আমীন!

'হাক্কিক্বত কিতাবেভি' থেকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সকল কিতাবসমূহ ইন্টারনেট ও বই বিতরণের মাধ্যমে দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে|

বর্তমানে পুরো দুনিয়ার মুসলমানগণ তিন ভাগে বিভক্ত| এর মাঝে প্রথমটি হল, সম্মানিত সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী প্রকৃত মুসলমান| এদেরকে **আহলে সুন্নাত** বা **সুন্নী মুসলিম** কিংবা '**ফিরকা-ই-নাজিয়া**', (জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত দল) বলা হয়| দ্বিতীয় দলটি হল, আসহাবে কিরামের শত্রু| তাদেরকে **শিয়া** বা **ফিরকা-ই দালালা**

বলা হয়| আর তৃতীয় দলটি হল সুন্নী ও শিয়াদের দুশমন| এদেরকে **ওহহাবী** বা **নজদী** বলা হয়, কারণ আরবের নজদ্ শহরে এদের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল| এদেরকে '**ফিরকা-ই মালউনা**'ও বলা হয়| কেননা এরা মুসলমানদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে থাকে, যা আমাদের **'সা'আদাত-ই আবাদিয়্যা** ও '**কিয়ামত ও আখেরাত** নামের পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে| আর মুসলমানদের যারা কাফির বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন| মুসলমানদেরকে এভাবে তিন ভাগে খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা ভাগ করেছে|

প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ নাফসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য, অর্থাৎ স্বভাব-প্রকৃতির মাঝে থাকা অজ্ঞতা ও পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সর্বদা বেশি বেশি '**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ**' বলা| আর ক্বলবের পরিশুদ্ধির জন্য, অর্থাৎ নাফস, শয়তান, অসৎ সঙ্গ এবং ক্ষতিকর ও ভ্রান্ত দর্শনের কিতাব থেকে আসা কুফর ও গুনাহের হাত থেকে বাঁচার জন্য '**আস্তাগফিরুল্লাহ**' বলা| যারা ইসলামের অনুসরণ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন| যারা নামাজ আদায় করে না, বেপর্দা নারীদের দিকে নজর দেয় ও অন্যের অনাবৃত সতরের দিকে দৃষ্টি দেয়, হারাম ভক্ষণ করে, তারা ইসলামের অনুসারী নয়| এদের দোয়া কবুল হয়না|

২০০১ খ্রিস্টাব্দ, ১৩৮০ হিজরী শামসী, ১৪২২ হিজরী কামরী

-১-

প্রারম্ভিকা

মাওলানা খালিদ বাগদাদী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ, কিতাবের শুরুতেই **ইমাম-ই রব্বানী আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহির '**মাকতুবাত**' কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের সতের তম মাকতুবকে স্থান দিয়ে নিজ কিতাবের সৌন্দর্য ও বরকত বৃদ্ধির কামনা করেছেন| **ইমাম-ই-রব্বানী**[1] কুদ্দিসা সিররুহু, এই মাকতুবে বলেছেন:

আমার মাকতুবটি বিসমিল্লাহ্ দ্বারা আরম্ভ করলাম| যিনি আমাদেরকে সকল প্রকার নিয়ামত প্রদান করেছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে কবুল করে সম্মানিত করেছেন ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হিসেবে আমাদের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত বানিয়ে মর্যাদাবান করেছেন, সেই আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অসংখ্য হামদ ও শুকরিয়া আদায় করছি|

এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও উপলব্ধি করা দরকার যে প্রত্যেকের প্রতি, প্রতিটি নিয়ামত কেবল মাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলাই প্রেরণ করেন| তিনিই একমাত্র প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব প্রদান করেন। তিনিই অস্তিত্ববান প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্বকে প্রতি মুহূর্তে টিকিয়ে রাখেন| বান্দার মাঝে বিদ্যমান যাবতীয় মহৎ ও সুউন্নত গুণাবলী, কেবলমাত্র তাঁরই দয়া ও ইহসানের প্রকাশ| আমাদের হায়াত, আকল, ইলম, ক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি ইত্যাদির সবই তাঁর কৃপা মাত্র| গুণে শেষ করা অসম্ভব এরূপ বিভিন্ন ধরণের অশেষ নিয়ামতের একমাত্র প্রেরক তিনিই| তিনিই মানুষকে বিপদ আপদ থেকে, দুর্ভোগ থেকে, কষ্টকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণকারী, দোয়া কবুলকারী এবং দুঃখ-কষ্ট লাঘবকারীও একমাত্র তিনিই| সকল ধরণের রিজিকের সৃষ্টিকারী ও চাহিদানুযায়ী যোগানদানকারী একমাত্র তিনিই| তাঁর ইহসান তথা অনুগ্রহ এতটাই ব্যাপক যে, গুনাহ করা সত্ত্বেও পাপিষ্ঠকে তিনি রিজিক থেকে বঞ্চিত করেননা| কৃত গুনাহসমূহকে এতটাই গোপন রাখেন যে, যারা তাঁর আদেশের অবাধ্য হয় ও নিষেধকে অমান্য করে তাদেরকে

[1]ইমাম রব্বানী, ১০৩৪ হিজরীতে (১৬২৪ খৃস্টাব্দে) ইনতিকাল করেছেন|

তাৎক্ষণিকভাবে সমাজে অপদস্ত ও অপমানিত করেন না, সম্ভ্রমের পর্দাকে ছিন্ন করেন না| তিনি এতটাই ক্ষমাশীল ও দয়ালু যে কৃতকর্মের কারণে শাস্তি ও আজাব ভোগের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন, এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন না| তাঁর নিয়ামত ও ইহসান তাঁর বন্ধু ও শত্রু সকলের মাঝেই বণ্টন করেন| কাউকেই বঞ্চিত করেন না | যাবতীয় নিয়ামতসমূহের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক মূল্যবান হিসেবে সঠিক পথ, সৌভাগ্য ও চিরমুক্তির পথ বলে দেন| এই পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার জন্য ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন| জান্নাতের সীমাহীন নিয়ামত, অশেষ ও অসংখ্য স্বাদ উপভোগের জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জনের জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর প্রিয় পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথের অনুসরণের জন্য আদেশ দিয়েছেন| এভাবেই মহান আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট| অন্যদের পক্ষ থেকে আসা কল্যাণও মূলত তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত| অন্যদেরকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারকারী, তাদের মাঝে কল্যাণ সম্পাদনের ইচ্ছার সঞ্চারকারী ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা প্রদানকারীও একমাত্র তিনিই| একারণেই, যেভাবেই হোক, যেখান থেকেই হোক কিংবা যার মাধ্যমেই হোক আমরা যত নিয়ামত পাই, তার সবই একমাত্র মহান আল্লাহ্ তায়ালার অসীম রহমতের বদৌলতেই| অতএব, তিনি ব্যতীত অন্য কারো থেকে মঙ্গল, কল্যাণ ও ইহসান প্রত্যাশা করা আমানত রক্ষাকারীর থেকে অন্যের রাখা আমানত চাওয়ার অনুরূপ অথবা ফকিরের কাছ থেকে সদকা প্রত্যাশার অনুরূপ| এই বক্তব্য যে যথার্থ ও সঠিক তা অজ্ঞরাও আলেমদের মত, বোকারাও বুদ্ধিমানদের মত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্নদের মত অবগত আছে| কেননা উপরে যা বলা হয়েছে তা দিবালোকের মতই স্পষ্ট, তা বুঝা জন্য চিন্তারও কোন প্রয়োজন নেই|

সকল ধরণের নিয়ামত প্রেরণকারী আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি মানুষের যথাসাধ্য শুকরিয়া আদায় করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মূলত মানবিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত| এটি বিবেক কর্তৃক আদিষ্ট এক কর্তব্য ও ঋণ| কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অবশ্য পালনীয় এই শুকরিয়া

যথাযথভাবে আদায় করা সহজ কোন কাজ নয়| কেননা অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে সৃষ্ট জীব মানুষ অতি দুর্বল, মুখাপেক্ষী, গুনাহগার ও অপরাধী| অথচ মহান আল্লাহ্ তায়ালা অনাদি, অনন্ত, চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব এবং সকল ধরণের দোষ ত্রুটি থেকে পূত পবিত্র| সকল ধরণের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র অধিকারী তিনি| মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মানুষের কোন দিক দিয়েই কোন ধরণের সাদৃশ্য বা তুলনার অবকাশ নেই| এমতাবস্থায় এরূপ অধম বান্দা ঐরূপ সুসম্মানিত ও সুউচ্চ মার্যাদার অধিকারী মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যথোপযুক্ত শুকরিয়া আদায় করতে কিভাবে সক্ষম হতে পারে? এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা মানুষের নিকট সৌন্দর্যময় ও অতি মূল্যবান মনে হয়, কিন্তু মহান আল্লাহ্র নিকট তা কুৎসিত ও মন্দ বিবেচিত হওয়ায় অপছন্দনীয় হতে পারে| আমরা যা কিছুকে সম্মান ও শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যম হিসেবে ধারণা করি তা মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় হতে পারে, অভদ্রতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে| এ কারণেই, মানুষ তার ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান ও ক্ষীণ দৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন ও শুকরিয়া আদায়ের উপায় সমূহের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়| শুকরিয়া আদায়ের ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবহিত না করা পর্যন্ত, আমাদের নিকট প্রশংসা আদায়ের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত জিনিসগুলো, প্রকৃত পক্ষে অবমাননা ও অমর্যাদাকরও হতে পারে|

মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ক্বলব, জিহবা ও শরীরের দ্বারা বিশ্বাস করতে ও পালন করতে বাধ্য যে শুকরিয়ার ঋণ ও ইবাদতসমূহ রয়েছে, মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তা অবহিত করা হয়েছে, তাঁর প্রিয় পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তন করা হয়েছে| মহান আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক প্রদর্শিত ও আদিষ্ট বান্দার জন্য অবশ্য পালনীয় এই কর্তব্যসমূহকে ইসলাম বলা হয় | মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি শুকরিয়া আদায়, কেবল মাত্র তাঁর পয়গম্বরের আনীত পথের অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব| তাঁর প্রদর্শিত পথকে অমান্য করে মনগড়া উপায়ে কৃত কোন শুকরিয়া, কোন ইবাদত আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করবেন না, পছন্দ করবেন না |

কেননা মানুষের নিকট উত্তম ও কল্যাণকর হিসেবে বিবেচিত এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা ইসলাম অপছন্দ করে এবং এগুলিকে কুৎসিত ও অকল্যাণকর হিসেবে ঘোষণা করে|

অতএব, যারা নিজেদেরকে জ্ঞানী দাবী করে তাদের উপর, আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করা আবশ্যক| রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত এই পথকে ইসলাম বলা হয়| আর রাসূলের অনুসারীকে **মুসলমান** বলা হয়| আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করাকে **ইবাদত** বলা হয়| ইসলামী জ্ঞান দুই ধরণের: দ্বীনী জ্ঞান ও বস্তুবাদী জ্ঞান| দ্বীনের সংস্কারপন্থীরা দ্বীনী জ্ঞানকে **স্কলাষ্টিক** আর **বস্তুবাদী জ্ঞান**কে যুক্তি নির্ভর মনে করে| দ্বীনি জ্ঞান আবার দুই ভাগে বিভক্ত|

১. ক্বলবের দ্বারা ইতিক্বাদ তথা বিশ্বাস করা আবশ্যক এমন জ্ঞান| এই ধরণের ইলমকে '**উসুলুদ-দ্বীন**' অথবা **ঈমানের জ্ঞান** বলা হয়| সংক্ষেপে **ঈমান** বলতে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অবহিত করা ছয়টি বিষয়কে বিশ্বাস করা, ইসলামকে কবুল করা এবং কুফরের আলামত হিসেবে বিবেচিত বিষয়গুলি বলা, করা কিংবা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাকে বুঝায়| এ কারণে প্রত্যেক মুসলমানেরই কুফরের আলামত হিসেবে বিবেচিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখা ও তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়ে রাখা আবশ্যক| যার ঈমান আছে, তাকেই **মুসলমান** বলা হয়|

২. শরীরের দ্বারা বা ক্বলবের দ্বারা পালন করতে হবে কিংবা বিরত থাকতে হবে এমন ইবাদতের জ্ঞান| পালন করার জন্য আদেশ করা হয়েছে এমন বিষয়গুলিকে **ফরজ** আর ত্যাগ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে এমন বিষয়কে **হারাম** বলা হয়| এগুলিকে **ফুরু আদ-দ্বীন** বা '**আহকামে ইসলামিয়া'** কিংবা 'ইসলামের ইলম' বলা হয়|

(প্রত্যেকের জন্য সর্বপ্রথম পালনীয় বিষয় হল, মুখে '**কালিমা-ই তাওহীদ**' বলা এবং এর অর্থকে বুঝে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা| কালিমা–ই তাওহীদ হল, '**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ**| এর অর্থ

হল, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল| এই কালিমা বিশ্বাস করাকে ঈমান বা ইসলাম গ্রহণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়| আর যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে **মুমিন** বা **মুসলিম** বলা হয়| ঈমান নিরবিচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক| একারণে কুফরের কারণ হিসেবে বিবেচিত কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকা উচিত, একইভাবে কুফরের আলামত হিসেবে বিবেচিত কোন কিছু ব্যবহার করাও উচিত নয়|

কুরআন করীম মহান আল্লাহ্ তায়ালার কালাম| মহান আল্লাহ্ তা'আলা, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নামক ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তা প্রেরণ করেছেন| পবিত্র কুরআন করীমের কালিমাগুলি আরবী| এই কালিমাগুলিকে মহান আল্লাহ্ তা'আলাই এভাবে সাজিয়েছেন| কুরআন করীমের আরবী কালিমাগুলি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই এইরূপে আয়াত, কালিমা বা হরফ হিসেবে প্রেরিত হয়েছে| এই হরফ বা কালিমাসমূহ ইলাহী কালামের অর্থকে ধারণ করে| একারণেই এই হরফ বা কালিমাগুলিকেও **কুরআন** বলা হয়| একই সাথে ইলাহী কালামের প্রতি নির্দেশকারী অর্থসমূহও কুরআন হিসেবে বিবেচিত| এই ধরণের ইলাহী কালামের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কুরআন মাখলুক তথা সৃষ্টি নয়| মহান আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য সিফাত সমূহের মতই অনাদি ও অনন্ত| হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম প্রতি বছর একবার, ঐ সময় পর্যন্ত অবতীর্ন হওয়া কুরআন করীমকে 'লাওহে মাহফুজ' এর ক্রমধারা অনুযায়ী তিলাওয়াত করতেন, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর সাথে সাথে একইভাবে তিলাওয়াত করতেন| রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ বছরে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম দুইবার এসে একইভাবে সম্পূর্ণ কুরআন করীম তিলাওয়াত করেছেন| প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাব্ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আলাইহিম আজমাঈনের প্রায় সকলেই সম্পূর্ণ কুরআন করীমের হাফিজ ছিলেন| রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পরে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হাফিজ সাহাবীদেরকে সম্মিলিত

করে ও বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো কুরআন করীমের প্রতিলিপিগুলিকে একত্রিত করে একটি পরিষদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কুরআন করীমকে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন| এভাবেই '**মুসহাফ**' নামক এই লিখিত কুরআন প্রকাশিত হয়| এই মুসহাফের প্রতিটি হরফকে যে সঠিক ও যথাযথ স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, এ ব্যাপারে তৎকালীন তেত্রিশ হাজার সাহাবীর সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন|

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহকে **হাদিস শরীফ** বলা হয়| এগুলির মাঝে যেগুলির অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে, কিন্তু কালিমাসমূহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিকে '**হাদিস-ই-কুদসী**' বলা হয়| হাদিস শরীফের বহু কিতাব রয়েছে| এগুলির মাঝে '**বুখারী** 'ও '**মুসলিম**' কিতাবদ্বয় বিখ্যাত| মহান আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের মধ্য থেকে বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়গুলিকে **ঈমান**, অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহকে **ফরজ** আর অবশ্য পরিত্যাজ্য বিষয়গুলিকে **হারাম** বলা হয়| ফরজ ও হারামকে একত্রে '**আহকামে ইসলামিয়্যা**' বলা হয়| ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি থেকে কোন একটিকেও যদি কেউ অবিশ্বাস করে, তবে সে **কাফিরে** পরিণত হবে|

মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় দ্বিতীয় বিষয়টি হল, ক্বলবের পরিশুদ্ধি| ক্বলব বলতে দুইটি জিনিসকে বুঝায়| বুকের মাঝে অবস্থিত গোশতের পিণ্ডকে সাধারণ অর্থে ক্বলব বলা হয়| হৃৎপিণ্ড নামক এই ক্বলব পশু পাখির মাঝেও বিদ্যমান| দ্বিতীয় প্রকারেরটি হল হৃৎপিণ্ডে বিদ্যমান অদৃশ্য ক্বলব| একে হৃদয়ও বলা হয়| দ্বীনি কিতাবসমূহে বর্নিত ক্বলবের দ্বারা মূলত এই হৃদয়কেই বুঝানো হয়| ইসলামী ইলম এই ক্বলবেই অবস্থান করে| বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বিষয়টি মূলত এই ক্বলবের সাথেই সম্পৃক্ত| বিশ্বাসী ক্বলব পবিত্র হয় আর অবিশ্বাসী ক্বলব অপবিত্র ও মৃত সাদৃশ হয়| ক্বলবের পরিশুদ্ধির জন্য চেষ্টা করা আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বায়িত্ব| ইবাদত করলে বিশেষ করে নামাজ পড়লে ও ইসতিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্বলব পরিশুদ্ধ হয়| হারামে লিপ্ত হলে ক্বলব নষ্ট হয়ে যায়| প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "**বেশি বেশি ইসতিগফার কর| যে বেশি বেশি**

ইসতিগফার করে, মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাকে রোগ ও বালা-মুসীবত থেকে হেফাজত করেন, অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে রিজিক প্রদান করেন"| ইসতিগফার বলতে '**আস্তাগফিরুল্লাহ**' বলা বুঝায়| দোয়া কবুলের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে | দোয়া পাঠকারী ব্যক্তির মুসলমান হতে হবে, কৃত গুনাহের জন্য তওবা করতে হবে এবং দোয়ায় যা বলা হচ্ছে তা জেনে, বুঝে ও বিশ্বাস করে পেশ করতে হবে| অপরিশুদ্ধ ক্বলবের দ্বারা কৃত দোয়া কবুল হয় না | নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় এর পর তিন দফা ইস্তিগফার পাঠকারী ব্যক্তির ক্বলব পরিশুদ্ধ হয় ও ক্বলব নিজেই দোয়া পাঠ করতে থাকে| মুখে করা দোয়ার সাথে যদি ক্বলব শরীক না হয়, তবে সেই দোয়ার দ্বারা কোন ফায়দা অর্জিত হয়না|

ইসলাম ধর্মের অবহিত করা দ্বীনী ইলমসমূহ, **আহলে সুন্নাত** আলেমগণের রচিত কিতাবসমূহের মাঝে লিপিবদ্ধ হয়েছে| আহলে সুন্নাত আলেমগণ কর্তৃক ঈমানী ও ইসলামী ইলমসমূহ সম্পর্কে যা অবহিত করা হয়েছে তার মাঝে, যেগুলোর অর্থ স্পষ্ট এমন '**নাস্**' তথা আয়াতে করীমা বা হাদিস শরীফ থেকে উদ্ধৃত সেগুলির কোন একটিকে কেউ অবিশ্বাস করলে **কাফিরে** পরিণত হবে| এই অবিশ্বাসের বিষয়টি গোপন করলে তাকে **মুনাফিক** বলা হবে| আর কেউ যদি অবিশ্বাসের বিষয়টি গোপন করার সাথে সাথে নিজেকে মুসলমান হিসেবে জাহির করে মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করার চেষ্টা করলে তাকে '**জিনদিক**' বলা হয়| কেউ অর্থ স্পষ্ট নয় এমন 'নাস্ 'এর ভুল ব্যাখ্যা করে ভুলভাবে বিশ্বাস করলে কাফির হবে না| তবে আহলে সুন্নাতের সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য তাকে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে| এই ধরণের ব্যক্তি যেহেতু অর্থ স্পষ্ট এমন 'নাস্ 'এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাই সে চিরকাল জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে না| পাপের শাস্তি ভোগের পরে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে| এদেরকে **আহলে বিদায়াত** বা **দালালাত ফেরকার** অনুসারী বলা হয়| বাহাত্তরটি দালালাত ফেরকা রয়েছে| এই ধরণের ব্যক্তিরাসহ কাফির ও মুরতাদদের কৃত ইবাদতসমূহ এবং জনসেবা, জনকল্যাণ ও খেদমতসমূহের কিছুই

কবুল করা হবে না| তাই এর দ্বারা আখিরাতের কোন ফায়দা অর্জিত হবে না| সহীহ বিশ্বাসের অধিকারী মুসলমানদেরকে **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত** কিংবা সংক্ষেপে **সুন্নী** বলা হয়| আহলে সুন্নাতের অনুসারীরা ইবাদতের ক্ষেত্রে চারটি মাজহাবে আলাদা হয়েছে| এই চার মাজহাবের অনুসারীদের প্রত্যেকেই একে অপরকে আহলে সুন্নাতের অনুসারী হিসেবে মনে করে ও পরস্পরকে ভালবাসে| যারা এই চার মাজহাব থেকে কোন একটিকে অনুসরণ করে না, তারা আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়| যারা আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয় তারা হয় কাফির, না হয় আহলে বিদায়াত| এ ব্যাপারে ইমাম রব্বানী এর মাকতুবাতের মধ্যে বিশেষ করে প্রথম খণ্ডের দুইশ ছিয়াশিতম মাকতুবে, '**দুর্‌রুল মুখতার** 'নামক কিতাবের জন্য রচিত তাহতাবীর হাশিয়ার 'যাবায়িহ' অংশে এবং '**আল-বাসাইর লিমুনকিরিত- তাওয়াসসুল বিআহলিল মাকাবির**' নামক কিতাবে দলীলসহ বর্ণনা রয়েছে| শেষের কিতাব দুইটি আরবী ভাষায় রচিত| শেষের কিতাবটি হিন্দুস্তানে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে| ১৩৯৫ হিজরীতে (১৯৭৫খৃ:) ও পরবর্তীতে কিতাবটি ইস্তানবুলে হাকীকাত কিতাবেভীর পক্ষ থেকে নিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে|

চার মাজহাবের কোন একটি অনুযায়ী যারা ইবাদত করে, তারা গুনাহের কাজ করলে কিংবা ইবাদতের ক্ষেত্রে ত্রুটি করলে, পরে এর জন্য তওবা করলে কৃত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে| যদি এর জন্য তওবা না করে তবে মহান আল্লাহ্ তায়ালা চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং এর জন্য জাহান্নামের আযাবের মুখোমুখি না করতে পারেন| আবার চাইলে গুনাহের জন্য কিছুটা আযাব দিয়ে পরবর্তীতে সেখান থেকে মুক্ত করবেন| অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের অনুসারীরা কৃত গুনাহের জন্য আযাব ভোগ করলেও এক পর্যায়ে গিয়ে অবশ্যই তা থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে| দ্বীনের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি, যা সম্পর্কে মূর্খরাও অবগত এবং যা অতি স্পষ্ট এমন বিষয়ের কোন একটিকে অবিশ্বাস করলে চিরকালের জন্য জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে| এরূপ যারা করে তাদেরকে **কাফির** কিংবা **মুরতাদ** বলা হয়|

আহলে কিতাব কিংবা কিতাবহীন এই বিবেচনায় কাফিরদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়| মুসলমানের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে দ্বীন থেকে বের হয়ে যে কাফির হয় তাকে **মুরতাদ** বলা হয়| হযরত ইবনে আবিদীন রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা, শিরকের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদের বর্ণনা করার সময় বলেছেন, 'মুরতাদ, মুলহিদ, জিনদিক, মাযুসী, মূর্তিপূজারী, পুরাতন গ্রীক দর্শনের অনুসারী, মুনাফিক, ৭২টি বাতেল ফেরকার অনুসারী যাদের কর্মকাণ্ড কুফরীতে পরিণত হয়েছে, (ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ), বাতেনী, ইবাহাতী ও দুরজীদের অন্তর্ভুক্ত সকলেই কিতাবহীন কাফির হিসেবে বিবেচিত"| কম্যুনিস্ট ও ম্যাসনরাও অনুরূপ| খ্রিস্টান ও ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত **তাওরাত** ও **ইনজিল** নামক কিতাব গুলিকে মানব সন্তান কর্তৃক পরিবর্তন ও ধ্বংস করার পরে যেরূপ ধারণ করেছে তাতে বিশ্বাস করে অনুসরণ করছে তারা কিতাবপ্রাপ্ত কাফির হিসেবে বিবেচিত| এদের মধ্য থেকে যারা কোন সৃষ্টির মাঝে উলুহিয়্যাতের সিফাত বিদ্যমান রয়েছে বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে **মুশরিক** বলা হয়| আল্লাহ্ তা'আলার **সিফাত-ই যাতিয়্যা** ও **সিফাত-ই সুবুতিয়্যা**কে একত্রে **উলুহিয়্যাত সিফাত** বলা হয়|

কিতাবহীন কিংবা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত কোন কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে নিজেকে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত করতে পারে| ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সে একজন নিষ্পাপ মুসলমানে পরিণত হয়| তবে, একজন **সুন্নী** মুসলমান হওয়া আবশ্যক| সুন্নী মুসলমান বলতে আহলে সুন্নাত আলেমদের 'রাহিমাহুমুল্লাহু তায়ালা' রচিত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে শিখে, তদনুযায়ী নিজের ঈমান, আমল, কথা বার্তা ও জীবন যাপন করাকে বুঝায়| দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি মুসলমান নাকি অমুসলমান তা, তার স্পষ্টভাবে বলা কথা ও কর্মের দ্বারা বুঝা যায়| তবে তা চাপ ও বাধ্যবাধকতা মুক্ত হতে হবে| এই ধরণের লোক আখিরাতে ঈমানসহ নাকি ঈমানহীন অবস্থায় গমন করেছে তা তার শেষ নিশ্বাসের সময় স্পষ্ট হয়| কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী পুরুষ কিংবা নারী যদি পরিশুদ্ধ ক্বলবের দ্বারা তওবা করে তবে তার গুনাহসমূহ ইন-শা-আল্লাহ ক্ষমা করা হবে| যার তওবা গৃহীত হয়, সে নিষ্পাপ শিশুর মত

হয়| **তওবা** কি ও কিভাবে তা করতে হয়, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা '**ঈমান ও ইসলাম**' এবং'**সাআদাত-ই আবাদিয়্যা**' নামক কিতাবের মত অন্যান্য ইলমে হাল কিতাবেও লিপিবদ্ধ রয়েছে|)

-২-

ঈমান ও ইসলাম

এই (**ইতিক্বাদ নামা**) পুস্তকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের **ঈমান** ও **ইসলাম** সম্পর্কিত একটি হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা দেয়া হবে| এই হাদিস শরীফের বরকতে মুসলমানদের ইতিক্বাদ পূর্ণতা পাবে (আরো শক্তিশালী হবে) এবং এর দ্বারা তারা চূড়ান্ত সফলতা ও চির সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে| আর এ কারণে তা বহু গুনাহ ও ভুলত্রুটির অধিকারী এই খালেদের (কুদ্দিসা সিররুহু) মুক্তি অর্জনের একটি মাধ্যম হবে, এই প্রত্যাশা করছি|

কোন কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন, সীমাহীন দয়া ও দানশীলতার মালিক এবং বান্দাদের প্রতি পরম সহানুভূতিশীল মহান আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে আমার উত্তম ইতিক্বাদ এই যে, কেবল মাত্র তিনিই স্বল্প পুঁজি ও অপরিচ্ছন্ন ক্বলবের অধিকারী এই ফকির খালেদের ভ্রান্ত কথাবার্তাকে ক্ষমা করতে পারেন, ত্রুটিপূর্ণ ইবাদতসমূহ কবুল করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শয়তানের অনিষ্ট থেকে (ও ইসলামের শত্রুদের ভ্রান্ত ও মিথ্যা কথাবার্তা ও লেখনীর দ্বারা প্রতারিত হওয়ার হাত থেকে) রক্ষা করুক ও আমাদের প্রশান্তি দিক| দয়াবানদের মাঝে শ্রেষ্ঠ দয়াময় ও দানশীলদের মাঝে শ্রেষ্ঠ দানশীলও কেবল মাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলাই|

ইসলামের আলেমগণের মতানুযায়ী, **মুকাল্লিফ** তথা প্রাপ্ত বয়স্ক ও বুদ্ধি সম্পন্ন প্রত্যেক নর-নারী মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য হল (মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে যাথাযথভাবে চিনা ও জানা) মহান আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত-ই-যাতিয়্যা ও সিফাত-ই-সুবুতিয়্যাকে সঠিকভাবে জানা ও তদনুযায়ী বিশ্বাস করা| এটাই প্রত্যেকের জন্য প্রথম ফরজ কর্তব্য| এ ব্যাপারে অজ্ঞতা কোন অজুহত হিসেবে গৃহীত হবে না, না জানাটা গুনাহ হিসেবে বিবেচিত হবে| খালেদ আল বাগদাদী 'কুদ্দিসা সিররুহু' এর এই বইটি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা, ইলম বিক্রি করা কিংবা খ্যাতি অর্জন করার জন্য নয় বরং একটি স্মৃতি ও খেদমত রেখে যাওয়ার জন্য রচনা করেছে | মহান আল্লাহ্ তায়ালা এই অসহায়

খালেদকে[2] ও সকল মুসলমানকে তাঁর শক্তির দ্বারা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক রূহের বরকতে মদদ করুন! আমীন!

(আল্লাহ্ তা'আলার **সিফাত-ই যাতিয়্যা (সত্বাগত গুনাবলী)** ছয়টি| এগুলি হল: **উজুদ, কিদাম, বাকা, ওয়াহদানিয়্যাত, মুখালাফাতুন লিল হাওয়াদিস্** এবং **কিয়াম-উ বিনাফসিহি**| উজুদ মানে নিজ থেকেই অস্তিত্বশীল হওয়া| কিদামের অর্থ হল, তাঁর অস্তিত্বের পূর্ব বলতে কিছু না থাকা অর্থাৎ যার অস্তিত্ব অনাদি| বাকা বলতে চিরন্তন অস্তিত্ব বুঝায়, যার কোন শেষ নাই| ওয়াহদানিয়্যাত বলতে, কোন দিক থেকেই শরীক, সমকক্ষতা কিংবা সাদৃশ্যতা না থাকা বুঝায়| মুখালাফাতুন লিল হাওয়াদিস্ হল, কোন ক্ষেত্রেই কোন সৃষ্টির সাথে কোন দিক থেকই সামঞ্জস্য না থাকা বুঝায়| কিয়াম বি নাফসিহি হল, আত্মনির্ভরশীল অস্তিত্ব অর্থাৎ অস্তিত্বের স্থায়িত্বের জন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী না হওয়া| এই ছয়টি সিফাতের কোনটিই কোন মাখলুকের মাঝে বিদ্যমান নয়| এই সিফাতগুলির কোন সৃষ্টির সাথে কোন রূপেই ন্যূনতম সম্পৃক্ততা বা সংশ্লিষ্টতা নেই | কোন কোন আলেম, ওয়াহদানিয়্যাত ও মুখালাফাতুন লিল হাওয়াদিস্ এই দুইটি সিফাতকে এক মনে করেছেন| তাই তাদের হিসেবে **সিফাত–ই যাতিয়্যা পাঁচটি**|)

আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত যা কিছু আছে তার সবকিছুকে '**মাসিওয়া**' বা **আলম** বলা হয়| কেউ কেউ একে প্রকৃতিও বলে থাকে | জগতের সবগুলিই অস্তিত্বহীন ছিল| সব গুলিকেই আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন| সবগুলি জগতই মুমকিন ও হাদিস| অর্থাৎ, শূন্য থেকে অস্তিত্ব পেতে পারে, অস্তিত্ব হারিয়ে বিলীন হয়ে যেতে পারে| '**যখন কিছুই ছিল না তখনও আল্লাহ্ তায়ালা ছিলেন**' এই হাদিস শরীফটি এই বিষয়টিই ব্যক্ত করে|

সৃষ্টিজগত যে হাদিস অর্থাৎ পরবর্তীতে সৃষ্টি করা হয়েছে তার আরেকটি প্রমাণ হল, এই জগত প্রতিটি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে, ধ্বংস

[2]খালিদ-ই বাগদাদী, ১২৪২ হিজরীতে (১৮২৬ খৃস্টাব্দে) শাম নগরীতে ইনতিকাল করেছেন|

ও গঠন হচ্ছে| জগতের সব কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে| (জগতে সর্বদাই ভৌত পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তুর অবস্থার রূপান্তর হচ্ছে আর রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তুর অণুর গঠনের পরিবর্তন হয়| এই প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক পদার্থ পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ন ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট নতুন পদার্থে পরিণত হয়| পরবর্তীতে আবিষ্কৃত নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে বস্তু ও অণু পরমাণুও বিলীন হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়|) কাদিম তথা অনাদি কোন কিছু পরিবর্তনশীল নয়| কেবল মাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলার যাত (স্বীয়সত্ত্বা) ও সিফাতসমূহ কাদিম| এগুলি অপরিবর্তনশীল| জগতের এরূপ পরিবর্তনশীলতা, একে অপরের থেকে অস্তিত্ব অর্জন অনাদি হতে পারেনা| অবশ্যই এর সূচনা আছে| শূন্য থেকে অস্তিত্ব পাওয়া প্রথম বস্তু বা উপাদান থেকে উৎপত্তি হওয়া আবশ্যক|

জগত যে মুমকিন অর্থাৎ শূন্য থেকে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে তার অপর একটি প্রমাণ হল, জগতের হাদিস হওয়া| অর্থাৎ, সব কিছুরই অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব পাওয়া|

মওজুদ তথা অস্তিত্বশীল কিছু দুই ধরণের হয়| এর একটি **মুমকিন** আর দ্বিতীয়টি **উজুদ**| (উজুদ শব্দের অর্থ অস্তিত্বপ্রাপ্ত হওয়া| তিন ধরণের উজুদ রয়েছে| প্রথমটি হল, **ওয়াজিবুল উজুদ**| অর্থাৎ, অস্তিত্বের বিদ্যমান থাকা আবশ্যক এমন উজুদ| যা সর্বদাই বিদ্যমান| যার কোন শুরু নাই, কোন শেষ নাই| যা অনাদি ও অনন্ত| কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ওয়াজিবুল উজুদ| দ্বিতীয়টি হল, **মুমতানিয়ুল উজুদ**| অর্থাৎ যার অস্তিত্ব অসম্ভব| কোন অবস্থাতেই যার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না| সর্বদাই অস্তিত্বহীন| আল্লাহ্র তা'আলার শরিক অনুরূপ| অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার কোন অংশীদার বা তাঁর মত কোন কিছুর অস্তিত্ব অসম্ভব| তৃতীয় প্রকারের অস্তিত্ব হল **মুমকিনুল উজুদ**| অর্থাৎ, যা অস্তিত্বশীলও হতে পারে আবার অস্তিত্বহীনও হতে পারে| সমস্ত সৃষ্টি ও জগত সমূহ এরূপ| **উজুদে**র বিপরীত হল **আদম**| আদম অর্থ শূন্যতা| সৃষ্টি জগত তথা সবকিছুই অস্তিত্ব লাভের পূর্বে শূন্য ছিল| অর্থাৎ অস্তিত্বহীন ছিল|) যদি মওজুদ শুধুমাত্র মুমকিন হত অথবা যদি

ওয়াজিবুল উজুদ না হত তবে কোন কিছুই অস্তিত্ব প্রাপ্ত হত না| (কেননা, শূন্য থেকে অস্তিত্ব লাভ করা এক ধরণের পরিবর্তন, একটি ক্রিয়া| পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রানুযায়ী, যে কোন বস্তুতে কোন ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার জন্য, ঐ বস্তুতে বাইরের কোন শক্তি প্রয়োগ করতে হয় এবং ঐ শক্তির উৎসের অস্তিত্ব ঐ বস্তুর পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকা আবশ্যক|) এ কারণে, মুমকিন মওজুদ, আপনা আপনি অস্তিত্ব পেতে পারেনা ও অস্তিত্বে অধিষ্ঠিতও থাকতে পারে না| কোন শক্তি যদি তাকে প্রভাবিত না করত, তবে তা সর্বদা অস্তিত্বহীনই থাকত, কখনো অস্তিত্বের অধিকারী হতনা| যা নিজেকেই অস্তিত্ব দিতে পারে না তা আবশ্যিক ভাবেই অন্য কোন মুমকিনকেও অস্তিত্ব দিতে পারেনা, সৃষ্টি করতে পারেনা| ওয়াজিবুল উজুদই কেবল মুমকিনকে সৃষ্টি করতে পারে| জগতের অস্তিত্ব, একে শূন্য থেকে অস্তিত্বদানকারী এক স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি নির্দেশ করে| অতএব, দেখা যাচ্ছে যে হাদিস ও মুমকিন নয় এমন একমাত্র উজুদ হল 'ওয়াজিবুল উজুদ' যিনি সর্বদাই বিদ্যমান ও সমস্ত মুমকিনের অস্তিত্ব প্রাপ্তির একমাত্র কারণ| তিনি কাদিম অর্থাৎ যার কোন শুরু নাই, সর্বদাই অস্তিত্ববান| ওয়াজিবুল উজুদের অর্থ হল, যার অস্তিত্ব কোন ভাবেই পরনির্ভরশীল নয় বরং আত্মনির্ভরশীল| অর্থাৎ আপনা আপনিই সর্বদা অস্তিত্ববান| যার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কারো ন্যূনতম অবদান নেই| অস্তিত্বে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য ও কোন কিছুর প্রতিই নূন্যতম মুখাপেক্ষী নন| এরূপ না হলে মুমকিনও হাদিস হতে হবে, সেক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা সৃষ্ট হতে হবে| যা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতা বিবর্জিত| ফারসী ভাষার **খোদা** শব্দের অর্থও আপনা আপনিই অস্তিত্ববান তথা কাদিম অর্থাৎ, যার কোন শুরু নেই, সর্বদাই বর্তমান| ("আল্লাহ আছেন ও একক" অধ্যায়টি দেখুন)

আমরা দেখতে পাই, সমগ্র জগতই আশ্চর্যজনক এক শৃঙ্খলা মেনে চলছে| প্রতি বছরই বিজ্ঞান এর নতুন নতুন দিক আবিষ্কার করছে| এই শৃঙ্খলা বা নিয়ম কানুনের যিনি স্রষ্টা তার মাঝে চিরঞ্জীব(**হাই**), সর্বজ্ঞানী (**আলিম**), সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (**কাদির**), সর্ব ইচ্ছার অধিকারী (**মুরীদ**), সর্বশ্রোতা (**সামি'**), সর্বদ্রষ্টা (**বাসীর**), বক্তা (**মুতাকাল্লিম**) ও সৃষ্টিকর্তার (**খালেক**) মত গুণাবলী থাকা আবশ্যক|

কেননা, মরণশীল ও অজ্ঞ হওয়া, সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, অন্ধ, বধির ও বোবা হওয়া ইত্যাদির প্রতিটিই ত্রুটি ও ঘাটতি হিসেবে বিবেচিত| এই জগতকে এতটা নিখুঁতভাবে যিনি সৃষ্টি করেছেন, এতটা সুশৃঙ্খলভাবে যিনি পরিচালনা করছেন এবং বিলুপ্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে যিনি রক্ষা করছেন তাঁর মাঝে এই ধরণের দোষ ত্রুটি থাকা অসম্ভব|

উপরিউক্ত মহৎ গুনাবলীসমূহ সৃষ্টির মাঝেও দেখা যায়| এগুলিকে মহান আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টির মাঝে এসব নিহিত করেছেন| এই সিফাতগুলি যদি আপন সত্ত্বায় বিদ্যমান না থাকত, তবে মাখলুকের মাঝে কিভাবে তিনি সৃষ্টি করতেন? সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান উত্তম সিফাতসমুহ যদি স্রষ্টার মাঝে না থাকত, তবেতো সৃষ্টিই তাঁর উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করত! যা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য| (অণু পরমাণু থেকে শুরু করে আকাশের নক্ষত্ররাজি পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসই বিশেষ হিসাব ও বিশেষ কানুনের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে| পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, মহাকাশ বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞানে যত সূত্র বা নিয়ম কানুন এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করা হয়েছে তাদের মাঝের পারস্পরিক শৃঙ্খলা বিবেককে হতবাক করে দেয়| এমনকি ডারউইন পর্যন্ত এরূপ পর্যবেক্ষন করে বলেছে, চোখের গঠনের মাঝে যে নিখুঁত শৃঙ্খলা ও সূক্ষ্ম কাজ রয়েছে তা নিয়ে যতই গবেষণা করি ততই অবাক হই| বাতাসে আটাত্তর শতাংশ নাইট্রোজেন, একুশ শতাংশ অক্সিজেন ও একভাগ হাইড্রোজেন, কার্বনডাই ওক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসের মিশ্রণ রয়েছে| এখন বাতাসে এই অক্সিজেনের পরিমাণ একুশ শতাংশের বেশি হলে আমাদের ফুসফুসে দহন হত, আবার একুশ শতাংশের চেয়ে কম হলে আমাদের রক্তে অবস্থিত খাদ্য কণাকে ভাঙ্গতে অক্ষম হত|এর অর্থ হল বাতাসে অক্সিজেনের এই পরিমাণের তারতম্য হলে মানুষ ও প্রাণীরা জীবন ধারণ করতে পারত না| আশ্চর্যের ব্যাপার হল বাতাসের এই অনুপাত ভূপৃষ্ঠের সর্বত্রই প্রায় অপরিবর্তনশীল| এটি আমাদের জন্য এক বড় নিয়ামত|| এটি মহান আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও পরম দয়ার প্রতি নির্দেশ করে, তাই

নয় কি? চোখের গঠন ত এই বিস্ময়ের কাছেই কিছু না। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সকল সূত্র ও নিয়ম কানুন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্য প্রণালীর যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর মাঝে কোন ধরণের ঘাটতি বা ত্রুটি থাকা সম্ভব কি?)

একারণেই আমরা বলি যে, জগতের স্রষ্টার মাঝে, সমস্ত উত্তম ও মহান সিফাতসমূহ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, একইভাবে সকল ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি ও মন্দ সিফাত থেকেও তাঁর মুক্ত থাকা জরুরী| কেননা ত্রুটিপূর্ণ কেউ খোদা বা সৃষ্টিকর্তা হতে পারেনা|

যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এই সব দলিল তো আছেই, একই সাথে বহু আয়াতে করীমা ও হাদিস শরীফে আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সব উত্তম সিফাতের প্রকৃত অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে স্পষ্টভাবে অবহিত করা হয়েছে| অতএব এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা জায়েজ নয়| সন্দেহ করলে তা কুফরের কারণ হবে| উপরে বর্নিত এই আটটি পরিপূর্ণ সিফাতকে '**সিফাত-ই সুবুতিয়্যা**' বলা হয়| অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত-ই সুবুতিয়্যা আটটি| সমস্ত কামাল সিফাতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা| তাঁর যাত, সিফাত ও কাজের মাঝে কোন ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি, গোঁজামিল ও পরিবর্তনের অবকাশ নেই| '**সিফাত-ই জাতিয়্যা**' ও ' **সিফাত-ই সুবুতিয়্যা**'কে একত্রে '**সিফাত-ই উলুহিয়্যা**' বলা হয়| কেউ যদি কোন সৃষ্টির মাঝে এই সিফাত-ই উলুহিয়্যার বিদ্যমান থাকার বিষয়ে বিশ্বাস করে, তবে সে **মুশরিকে** পরিণত হবে|

-৩-

ইসলামের মূলনীতিসমূহ

সমস্ত জগতসমূহকে প্রতিটি মুহূর্তে অস্তিত্ব প্রদানকারী সত্ত্বা, যিনি নিজে প্রতিটি মুহূর্তে হাজির ও নাজির, যিনি সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণের উৎস এবং যাবতীয় নিয়ামত প্রদানকারী, সেই মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য নিয়ে এখন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় হাদিসটির ব্যাখ্যা শুরু করছি|

মুসলমানদের বীর পুরুষ, আসহাবে কিরামের মাঝে অন্যতম শ্রেষ্ঠজন, সর্বদা সত্য বলার কারণে খ্যাতি অর্জনকারী, প্রিয় আমিরুল মোমেনিন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন:

"ঐ দিন এমন একদিন ছিল, যখন আসহাবে কিরামদের থেকে আমরা কয়েকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে তাঁর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম"| ঐদিন ও ঐ মুহূর্ত এমন বরকতময় ও মহা মূল্যবান ছিল যে, অনুরূপ আরেকটি মুহূর্ত পুনরায় উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব| ঐদিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকার কারণে নিজেরা সম্মানিত হয়ে ছিল| রূহের রসদ সরবরাহকারী, জান সমূহে স্বাদ ও প্রশান্তি প্রদানকারী মুবারক চেহারার সৌন্দর্য অবলোকনের সৌভাগ্য অর্জন করেছিল| এমন একদিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য তিনি বলেছেন, "ঐ দিন এমন একদিন ছিল..."| হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে মানবরূপে দেখার ও তাঁর কন্ঠস্বর শুনার, মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় তথ্য অতি সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক মুখ থেকে সরাসরি শ্রবণ করার সৌভাগ্য যে দিনে অর্জিত হয়েছে, এই দুনিয়ার জীবনে অনুরূপ আরেকটি মূল্যবান ও মর্যাদাবান মুহূর্তের সন্ধান পাওয়া সম্ভব কি?

"ঐ সময়ে, আমাদের নিকট এমন একজন আগমন করলেন যেন পূর্ণচাঁদের উদয় হল| তাঁর পোশাক ধবধবে সাদা আর কেশ কুচকুকে কালো ছিল| তার মাঝে ধুলাবালি কিংবা ঘামের মত ভ্রমণের কোন চিহ্ন বিদ্যমান ছিল না| রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী তথা আমাদের মধ্য থেকে কেউই তাকে চিনতে পারিনি| অর্থাৎ তিনি আমাদের পূর্বপরিচিতদের কেউ ছিলেন না| তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসলেন এমনভাবে যে, তার হাঁটুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁটু মুবারকের সংস্পর্শে রাখলেন"| মানুষের অবয়বে আগত ব্যক্তি ছিলেন মহান ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম| হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের ঐভাবে বসাটা আদবের বরখেলাপ বলে মনে হলেও আসলে ঐ অবস্থার দ্বারা আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে| এর দ্বারা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য লজ্জিত হওয়া কিংবা অস্বস্থিবোধ করা উচিত নয়| একইভাবে, উস্তাদের মাঝেও গর্ব-অহংকার, উদ্ধত্য থাকা উচিত নয়| হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম উক্ত ঘটনার মাধ্যমে আসহাবে কিরামকে এই শিক্ষা দিয়েছেন, প্রত্যেকেরই ধর্মীয় বিষয়ে কিছু জানার ইচ্ছা হলে তা সাচ্ছন্দ্যের সাথে ঐ বিষয়ের অভিজ্ঞ মুয়াল্লিমের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া উচিত| এ বিষয়ে লজ্জা বোধ করা উচিত নয়|| কেননা দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে লজ্জিত হওয়া কিংবা মহান আল্লাহ্ তা'আলার হক্ব আদায়, তা শেখানো বা শেখার ক্ষেত্রে সঙ্কোচ বোধ করা গ্রহণীয় নয়|

"ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তার হস্তদ্বয়কে হযরত রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক হাঁটুর উপরে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, **ইয়া মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন**" | ইসলামের শাব্দিক অর্থ, অবনত মস্তকে আত্মসমর্পন করা| রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম শব্দটিকে, ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের সামগ্রিক নাম হিসেবে নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন|

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলছেন, ইসলামের মূলনীতির প্রথমটি হল, "**কালিমা-ই শাহাদাত পাঠ করা**"| অর্থাৎ

‘আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু’ বলাকে বুঝায়| অন্য কথায়, কথা বলতে সক্ষম এমন প্রত্যেক আকেল ও বালেগ ব্যক্তির এই কথা মুখে স্বীকার করা যে, **“আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও জমিনে ইবাদত পাওয়ার হক্বদার বা উপাসনার যোগ্য কেউ নাই| শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্ তা‘আলাই প্রকৃত মাবূদ বা উপাস্য| তিনি ওয়াজিবুল উজুদ| তিনিই সকল শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী| সকল ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে তিনি পাক ও পবিত্র| তাঁর নাম হল আল্লাহ্”** এবং এ কথায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা| একই ভাবে মনেপ্রাণে এই সাক্ষ্য দেয়া যে, “হযরত আবদুল্লাহর পুত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামের সেই সুমহান ব্যক্তিত্ব, যিনি ছিলেন গোলাপের মত কোমল, শুভ্র ও রক্তিমের মাঝামঝি উজ্জ্বলবর্ণের, মায়াবী চেহারার অধিকারী, যার ছিল কাল চোখ ও ভ্রূ, প্রশস্ত কপাল, যিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, যার ছায়া কখনো মাটিতে পড়ত না, যিনি ছিলেন মৃদু ও মিষ্টভাষী, মক্কার হাশেমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিধায় আরব বলা হত, তিনি মহান আল্লাহ্ তা‘আলার বান্দা ও রাসূল বা পয়গম্বর”| ওহাব এর কন্যা হযরত আমেনা তাঁর মাতা ছিলেন| তিনি (৫৭১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ রোজ সোমবার ফজরের সময়) পবিত্র মক্কা নগরীতে দুনিয়ায় আগমন করে ছিলেন| চল্লিশ বছর বয়সে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম মারফৎ তাঁকে তাঁর নবুয়্যতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল [সোমবার, ১৭ রমযান, ৬১০]| এই বছরকে এ কারণে **আবির্ভাবের** বছর বলা হয়| এরপরে তের বছর পবিত্র মক্কা নগরীতে নিরলসভাবে মানুষদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন| তারপর মহান আল্লাহ্ তা‘আলার নির্দেশে সেখান থেকে পবিত্র মদিনা নগরীতে হিজরত করেন| এখান থেকেই তিনি ইসলামকে জগতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন| হিজরতের দশ বছর পরে অর্থাৎ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে, (হিজরী রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ রোজ সোমবার) পবিত্র মদিনা নগরীতে ইনতিকাল করেন| (ইতিহাস বেত্তাদের মতে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মক্কা-ই মুকাররমা থেকে মদিনা-ই মুনাওয়ারাতে হিজরতের সময়, ৬২২ খৃস্টাব্দে, সফর মাসের সাতাশ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার

সন্ধ্যার নিকটবর্তী সময়ে 'সাওর 'পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন| সেখান থেকে সোমবার রাতে বের হয়েছিলেন| হিজরী রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখ রোজ সোমবার (খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসের বিশ তারিখে, রূমী পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী সেপ্টেম্বরের সাত তারিখে) পবিত্র মদিনা নগরীর নিকটবর্তী 'কুবা' নামক গ্রামে উপস্থিত হন| এই আনন্দের দিবসটি মুসলমানদের '**হিজরী শামছী**' বছরের সূচনা লগ্ন হিসেবে গৃহীত হয়েছে| শিয়াদের হিজরী শামছি বছরের সূচনা এর ছয় মাস পূর্বে অর্থাৎ, অগ্নি পূজারি মাজুসী কাফিরদের নওরোজ উৎসব হিসেবে পালিত মার্চ মাসের বিশ তারিখকে বছরের প্রথম দিন হিসেবে গণ্য করে| রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সপ্তাহের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কুবায় রাত্রি যাপন করেছিলেন, যখন সর্বত্র বছরের ঐ দিন রাত ও দিন সমান ছিল| তিনি পরের দিন অর্থাৎ জুমার দিনে কুবা ত্যাগ করে পবিত্র মদিনায় উপনীত হয়েছিলেন| ঐ বছরের পয়লা মুহাররমকে (জুমাবার, ১৬ জুলাই) হিজরী কামরী বর্ষ পঞ্জিকার প্রথম দিন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল| এ কারণে যেকোন খৃস্টীয় পঞ্জিকা থেকে এই হিজরী সামছী পঞ্জিকা ৬২২ বছর কম হয়| একইভাবে হিজরী শামছী পঞ্জিকা থেকে খৃস্টীয় পঞ্জিকা ৬২১ বছর বেশি হয়|)

২. ইসলামের পাঁচটি মূলনীতির দ্বিতীয়টি হল, যাবতীয় শর্ত ও রুকন মেনে প্রতিদিন পাঁচবার" **ওয়াক্ত মত নামাজ আদায় করা**"| প্রত্যেক মুসলমানের উপরই প্রতিদিন ওয়াক্ত অনুযায়ী পাঁচ বার নামাজ আদায় করা এবং নামাজগুলি যে ওয়াক্ত মত আদায় করেছে তা জানা ফরজ| জাহিল ও লা-মাজহাবিদের প্রস্তুতকৃত ভ্রান্ত সময় পঞ্জিকার অনুসরণ করে, ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই নামাজ আদায় করলে তা সহীহ হয় না, বরং গুনাহ হয়| ঐ সময়সূচী অনুসরণ করার ফলে, যোহরের ফরজের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত ও মাগরিবের ফরজ নামাজকে 'কারাহাত ওয়াক্তে' আদায় করা হয়| কারাহাতের সময়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে **অশেষ রহমত** কিতাবের চতুর্থ অধ্যায়ে এবং **মিফতাহুল জান্নাহ** কিতাবের শুরুর পৃষ্ঠায়| মুয়াজ্জিনের দেয়া আযানের দ্বারা বুঝা যায় যে নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়েছে| [কাফের, বিদয়াতি এবং মাইকের দ্বারা দেয়া যান্ত্রিক

আওয়াজকে '**আযান-ই মুহাম্মদী**' বলা যায় না|] সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতকে বিশেষ সতর্কতার সাথে পালন করে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি হৃদয় ও মনকে পুরোপুরি সঁপে দিয়ে ওয়াক্তের সমাপ্তির পূর্বেই নামাজসমূহ আদায় করা উচিত| পবিত্র কুরআন করীমে নামাজকে সালাত বলা হয়েছে| সালাতের অর্থ হল, মানুষের ক্ষেত্রে দোয়া করা, ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে ইসতিগফার করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে হলে দয়া করা, রহমত করা| ইসলামের পরিভাষায়, সালাত বলতে, ফিকাহের কিতাবসমূহে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করা ও সুনির্দিষ্ট কিছু পাঠ করাকে বুঝায়| '**ইফতিতাহ তাকবীর** 'এর মাধ্যমে নামাজ পড়া শুরু করা হয়| অর্থাৎ, **আল্লাহু আকবর** বলে পুরুষদের ক্ষেত্রে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলে নাভির নিচে হাতবাঁধা আর নারীদের ক্ষেত্রে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলে বুকের উপরে হাত বাঁধার মাধ্যমে নামাজ শুরু করা হয়| আর শেষ বৈঠকে, মাথাকে প্রথমে ডান কাঁধে ও পরে বাম কাঁধের দিকে ফিরিয়ে সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা হয়|

৩. ইসলামের পাঁচটি মূলনীতির তৃতীয়টি হল, "**সম্পদের যাকাত প্রদান করা**"| যাকাতের শাব্দিক অর্থ হল পরিষ্কার করা, সংশোধন করা, পরিশুদ্ধ করা, প্রশংসা করা, সুন্দর ও উত্তম হওয়া| ইসলামের পরিভাষায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও **নিসাব** হিসেবে বিবেচিত সম্পদের অতিরিক্ত হলে মালিক ব্যক্তি তা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ আলাদা করে, পবিত্র কুরআন মজিদে বর্ণিত মুসলমানদেরকে তা বিনীতভাবে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়| সাত শ্রেণীর মানুষকে যাকাত প্রদান করা যায়| চার মাজহাবেই, চার ধরণের সম্পদের জন্য যাকাতের বিধান রয়েছে| এগুলি হল: স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত, ব্যবসায়িক মালের যাকাত, বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় তৃণভূমিতে বিচরণকারী চতুষ্পদ প্রাণীর যাকাত এবং মাটিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত| চতুর্থ প্রকারের যাকাতকে '**উশর্**' বলা হয় যা জমি থেকে ফসল সংগ্রহের সাথে সাথেই প্রদান করতে হয়| অন্য তিন ধরণের সম্পদের ক্ষেত্রে, নিসাব পরিমাণ হওয়ার পর এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত দিতে হয়|

৪. ইসলামের চতুর্থ মূলনীতি হল, "**পবিত্র রমজান মাসের প্রতিদিন রোজা রাখা**"| রোজা রাখাকে আরবীতে '**সাওম**' বলা হয়| সাওমের আভিধানিক অর্থ হল, এক জিনিসকে অপর জিনিস থেকে রক্ষা করা| ইসলামের পরিভাষায়, সাওম বলতে, যথাযথ শর্ত মেনে পবিত্র রমজান মাসে, আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালন করে প্রত্যেকদিন তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করা বা সংবরণ করা বুঝায়| এই তিনটি বিষয় হল: পান করা, আহার করা ও যৌনক্রিয়া করা| রমজান মাস আকাশে হেলাল (নতুন চাঁদ) দেখার মাধ্যমে শুরু হয়| আগে থেকে হিসাব করা পঞ্জিকার সময় অনুযায়ী শুরু হয় না|

৫. ইসলামের পঞ্চম মূলনীতিটি হল, "**সামর্থ্যবান ব্যক্তি জীবনে একবার হজ্জ পালন করা**"| যার মক্কা-ই মুকাররমায় যাওয়ার মত পাথেয়, শারীরিক সুস্থতা ও পথের নিরাপত্তা আছে এবং সেখানে গিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের যাদের ভরণ পোষণের দ্বায়িত্ব তার উপর রয়েছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ –সম্পদের ব্যবস্থা করতে পারে, তার উপর জীবনে একবার কা'বা শরীফ তওয়াফ করা ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ফরজ|

"আগত ব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উপরোক্ত জবাব শোনার পরে বললেন, '**ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি যথার্থই বলেছেন**'|" হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, সম্মানিত সাহাবীদের মধ্য থেকে সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ওই ব্যাক্তির এই আচরণে অবাক হয়েছিলেন যে তিনিই প্রশ্ন করেছেন, আবার প্রদত্ত জবাবের সঠিক হওয়ার ব্যাপারে তিনিই সত্যায়ন করেছেন| কোন কিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার অর্থ হল, অজানা বিষয়কে জানার ইচ্ছা পোষণ করা| কিন্তু "আপনি যথার্থই বলেছেন", এই কথাটির দ্বারা জিজ্ঞাসাকারী যে বিষয়টি জানতেন তাই প্রতীয়মান হয়|

উপরে বর্ণিত ইসলামের পাঁচটি মূলনীতির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল, '**কালিমা-ই শাহাদাত**' পড়া ও এর অর্থকে বিশ্বাস করা| এর

পরেরটি হল, নামাজ আদায় করা| তারপর রোজা রাখা, এরপর হজ্জব্রত পালন করা| সর্বশেষটি হল, যাকাত প্রদান করা| কালিমা-ই শাহাদাতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করেছেন| অবশিষ্ট চারটির গুরুত্বের ক্রম ধারা, অধিকাংশ আলেমের মতে উপরে প্রদত্ত ক্রমের অনুরূপ| কালিমা-ই শাহাদাত, ইসলামের শুরুতেই ফরজ হয়েছে| এই বিবেচনায় এটিই সর্ব প্রথম ফরজ| দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, নবুয়্যত প্রকাশের দ্বাদশ বছরে ও হিজরতের বছর খানেক পূর্বে মিরাজের রজনীতে ফরজ হয়েছে| পবিত্র রমজান মাসের রোজা হিজরতের দ্বিতীয় বছরের শা'বান মাসে ফরজ হয়েছে| যে বছর রমজান মাসের রোজা ফরজ, সেই বছরের রমজান মাসেই যাকাত ফরজ হয়েছে| আর হজ্জ হিজরতের নবম বছরে ফরজ হয়েছে|

কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের এই পাঁচটি ভিত্তির কোন একটিকে অস্বীকার করে অর্থাৎ ফরজ হিসেবে মেনে না নেয়, অবিশ্বাস করে অথবা অমর্যাদা করে, তাচ্ছিল্য করে তবে (নাউজুবিল্লাহ্) সে কাফির হয়ে যাবে| একই ভাবে, অন্য সব কিছুর ক্ষেত্রেও যেগুলির হালাল কিংবা হারাম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে অবহিত করা হয়েছে, তার কোন একটিকে মেনে না নিলে অর্থাৎ কোন হালালকে হারাম কিংবা হারামকে হালাল হিসেবে বিবেচনা করলে সে ব্যক্তিও কাফির হয়ে যায়| দ্বীনের আবশ্যকীয় ইলম অর্থাৎ যা জানা সকলের জন্যই ফরজ এবং যা সম্পর্কে মুসলিম রাজ্যে বসবাসকারী সকলেই অবগত এমনকি কোনো অজ্ঞ পর্যন্ত যেসব বিষয়ে শুনেছে, জেনেছে এমন দ্বীনী ইলমের কোন একটিকে অস্বীকার করলে, অপছন্দ করলেও সে ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হবে|

(উদাহরণ স্বরূপ: শুকরের গোশত খাওয়া, মদ পান করা, জুয়া খেলা, নারীদের জন্য মাথা, চুল, হাত-পা উম্মুক্ত রেখে ও পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান অনাবৃত করে অন্যকে প্রদর্শন করানো হারাম| অর্থাৎ, এগুলি মহান আল্লাহ্ তায়ালা এসব করতে নিষেধ করেছেন| আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ সমূহের ব্যাপারে আমাদেরকে অবহিত করেছে এমন চারটি হক্ব মাজহাবে, পুরুষের

সতরের ব্যাপারে অর্থাৎ অন্যের দেহের যেসব স্থান দেখা ও নিজের দেহের যেসব স্থান অন্যকে দেখানো হারাম করা হয়েছে সেসব স্থানের ব্যাপারে ভিন্ন মত দেয়া হয়েছে| প্রত্যেক মুসলমানেরই নিজ মাজহাবের মতানুযায়ী সতর ঢাকা সকলের উপরই ফরজ| কারো যদি এসব স্থান উম্মুক্ত থাকে, তবে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া অন্যদের জন্য হারাম| '**কিমিয়া-ই সা'আদাত** 'নামক কিতাবে বলা হয়েছে, মেয়েদের ও নারীদের মাথা, চুল, হাত-পা ইত্যাদি খোলা রেখে রাস্তায় চলাফেরা করা যেমন হারাম, একই ভাবে পাতলা বা আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করে, সেঁজে গুজে সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হওয়াও হারাম|

তাদের এইভাবে বাইরে চলাচলের ব্যাপারে যারা অনুমতি কিংবা সম্মতি দিল ও পছন্দ করল সেই সব মা, বাবা, স্বামী ও ভাইও তাদের দ্বারা কৃত গুনাহের ভাগীদার হবে এবং একই সাথে জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে| তবে তওবা করলে হয়ত ক্ষমা প্রাপ্ত হবে ও জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাবে| কেননা আল্লাহ্ তায়ালা তওবাকারীদের পছন্দ করেন| আকিল ও বালিগ মেয়েদের ও নারীদের উপর পর পুরুষদের থেকে নিজেদের পর্দা করার ব্যাপারে হিজরতের তৃতীয় বছরে আদেশ দেয়া হয়েছে| ইংরেজ গুপ্তচরদের ও তাদের ফাঁদে পা দেয়া জাহিলদের কথায় বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়| তারা হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের বেপর্দার চলাফেরাকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে বলে যে, পর্দার বিষয়টি পরবর্তী কালের ফ কিহ্দের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে|

নিজেকে মুসলমান দাবী করে এমন প্রত্যেকেরই, নিজের কাজ কর্ম, চাল-চলন ইত্যাদি ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক| না জানা থাকলে, কোন আহলে সুন্নাতের অনুসারী আলেমকে জিজ্ঞাসা করে অথবা ঐ আলেমদের রচিত কিতাবসমূহ পড়ে শিখে নেয়া জরুরী| কৃতকর্ম যদি শরীয়ত অনুযায়ী না হয়, তবে গুনাহ ও আযাব থেকে মুক্তি পাবে না| এজন্য সকলেরই উচিত প্রতি দিন আন্তরিকতার সাথে তওবা করা| তওবা করলে অবশ্যই গুনাহ ও কুফুরী আচরণ মাফ করে দেয়া হবে| তওবা না করলে, দুনিয়া ও জাহান্নাম সর্বত্রই পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে| এই আযাবের ব্যাপারে, আমাদের কিতাবের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা

হয়েছে| দোয়া করে **অশেষ রহমত** কিতাবের ষষ্ঠ অধ্যায় দেখুন| মুসলমান যদি কবীরা গুনাহ করে তবে ঐ গুনাহ অনুযায়ী আযাব ভোগের পরে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে| আর যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অবিশ্বাস করে ও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত ঐ সব কাফির ও খোদাদ্রোহীরা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল জ্বলতে থাকবে|

পুরুষ ও নারীদের নামাজে ও নামাজের বাইরে সব সময় শরীরের যেসব স্থান ঢেকে রাখতে হয় সেসব স্থানকে সতর বা **আওরাত** বলা হয়| সতরের স্থানকে উম্মুক্ত রাখা ও অন্যের সতরের স্থানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হারাম| যারা বলে, ইসলামে সতর বলে কিছু নাই তারা কাফির হয়ে যায়| ইজমা'র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ চার মাজহাব অনুযায়ীই যে সব স্থান সতর হিসেবে বিবেচিত সেসব স্থানকে উম্মুক্ত রাখা ও অন্যের সতরের স্থানের প্রতি দৃষ্টি দেয়াকে যারা হালাল বলে এবং এ ব্যাপারে অবহেলা করে অর্থাৎ এর আযাবের ভয়ে ভীত না হয় তারাও কাফিরে পরিণত হয়| নারীদের জন্য নিজের দেহকে উম্মুক্ত করা ও পুরুষদের সামনে গান পরিবেশন করা, এমনকি হামদ-নাত গাওয়া ইত্যাদি হারাম| পুরুষদের হাঁটু ও রান হাম্বলী মাজহাব অনুযায়ী সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়|

নিজেকে মুসলমান দাবী করে এমন ব্যক্তির জন্য ঈমান ও ইসলামের শর্তসমূহ এবং চার মাজহাবের ইজমা হয়েছে অর্থাৎ ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে এমন ফরজ ও হারামের বিষয়কে যথাযথভাবে জানা ও গুরুত্ব সহকারে মানা আবশ্যক| না জেনে থাকাটা কোন অজুহাত হিসেবে গৃহীত হবে না এবং তা কুফরের সমপর্যায়ের হবে| নারীদের জন্য মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের তালু ব্যতীত পুরো শরীর চার মাজহাব অনুযায়ীই সতরের অন্তর্ভুক্ত| যেসব স্থান সতর হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়নি, অর্থাৎ চার মাজহাবের কোনটির মতে সতরের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোন স্থানকে অবহেলা করে অন্যের সামনে প্রকাশ করলে ব্যক্তি কাফির না হলেও, নিজ মাজহাব অনুযায়ী তা সতরের অন্তর্ভুক্ত হলে কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে| পুরুষের জন্য হাঁটুর উপরের রান উম্মুক্ত রাখার হুকুম এরূপ|

শরীয়তের এরূপ আবশ্যকীয় বিষয় না জানা থাকলে, দ্রুত শিখে নেয়াটাও ফরজ|

শিখার সাথে সাথে তওবা করতে হবে ও সতর মেনে চলতে হবে| মিথ্যা বলা, চোগলখোরী করা, গীবত করা, অপবাদ দেয়া, চুরি করা, ভেজাল দেয়া, খেয়ানত করা, হৃদয় ভাঙ্গা, ফিতনার উদ্রেক করা, বিনা অনুমতিতে অপরের সম্পদ ব্যবহার করা, শ্রমিকের কিংবা কুলির পারিশ্রমিক প্রদান না করা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অর্থাৎ আইন-কানুন অমান্য করা, রাষ্ট্রীয় বিধি বিধান না মানা এবং কর বা শুল্ক প্রদান না করা এসব গুনাহের কাজ| এসব কাজ কাফিরদের সাথে করা বা অমুসলিম দেশে করাও হারাম| অজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেনা ও দ্বীনের অতি জরুরী নয় এমন বিষয় না জানাটা কুফরের কারণ নয়, তবে 'ফিসক্' তথা গুনাহের কাজ|)

-৪-

ঈমানের শর্তসমূহ

"ঐ ব্যক্তি আরো জিজ্ঞাসা করলেন, '**ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঈমান কি? এ সম্পর্কে আমাকে বলুন**'|" ইসলাম কি, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার ও জবাব পাওয়ার পর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাদের প্রিয় রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঈমানের হাক্বীকত, এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন| ঈমানের শাব্দিক অর্থ হল, কাউকে পূর্ণ সত্যবাদী হিসেবে জানা, বিশ্বাস করা| ইসলামের পরিভাষায়, রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত সত্য পয়গম্বর হিসেবে, তাঁর নির্বাচিত সত্য নবী বা খবর প্রদানকারী হিসেবে জানা ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করা, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদেরকে সংক্ষেপে যা জানিয়েছেন তা সংক্ষেপে বিশ্বাস করা আর বিস্তারিত ও গভীরভাবে যা জানিয়েছেন তা অনুরূপভাবে বিশ্বাস করা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী মুখে 'কালিমা-ই শাহাদাত' বলাকে ঈমান বলা হয়| আগুন যে পোঁড়ায় আর বিষাক্ত সাপের ছোবলে যে মারা যেতে হয় তা যতটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আগুন ও সাপ থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়, ঠিক একইভাবে মনে প্রাণে পূর্ণরূপে মহান আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর মহান সিফাতসমূহের বড়ত্বকে উপলব্ধিসহ বিশ্বাস করে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ও সৌন্দর্যের সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় পুণ্যের দিকে তীব্রতার সাথে ধাবিত হওয়া আর তাঁর গজব ও আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে পাপ থেকে প্রাণপণ পলায়নের চেষ্টা করা হল শক্তিশালী ঈমানের পরিচায়ক| মর্মর পাথরে খোদাই করে যেমন লেখা হয় তেমনি ভাবে হৃদয়ে ঈমানকে প্রতিস্থাপন করা জরুরী|

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে ঈমান ও ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন তা একই| দুইটিতেই 'কালিমা- ই শাহাদাত' এর মর্মার্থকে বিশ্বাস করা আবশ্যক| 'উমুম' ও 'খুসুস' এর

বিবেচনায় এদের মাঝে কিছু পার্থক্য থাকলেও ইসলামের মাঝে কোন ভিন্নতা নাই, যদিও এদের অভিধানিক অর্থ ভিন্ন|

ঈমান কি একক কিছু? না কি কয়েকটি অংশের সমষ্টি? যদি সমষ্টি হয়ে থাকে, তবে এর কয়টি ভাগ রয়েছে? আমল ও ইবাদতসমূহ কি ঈমানের অংশ? নাকি এর বাইরের কিছু? 'আমার ঈমান আছে 'এই কথাটি বলার সময় ইনশাআল্লাহ্ বলা জায়েজ নাকি জায়েজ নয়? ঈমানের ক্ষেত্রে অল্প বা বেশি বলা যায় কি? ঈমান কি মাখলুক? ঈমান গ্রহণের ক্ষমতা মানুষের আছে কি? মুমিনরা কি বাধ্য হয়ে ঈমান গ্রহণ করেছে? ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে জবরদস্তি আছে কি? যদি থেকে থাকে তবে কেন ঈমান গ্রহণের জন্য আলাদাভাবে প্রত্যেককে আদেশ দেয়া হয়েছে? এইসব প্রশ্নের আলাদা আলাদা জবাব প্রদানের জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন| একারণে এখানে প্রত্যেকটি প্রশ্নের আলাদা আলাদা জবাব দিচ্ছি না| তবে এখানে এতটুকু জানা দরকার যে 'আশয়ারী' ও' মুতাজিলা' মাজহাব অনুযায়ী, মুমকিন নয় এমন কোন কিছু করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ দেয়া জায়েজ নয়| এমন কি কোন কিছু মুমকিন হওয়ার পরও যদি মানুষের সাধ্যাতীত হয়, মুতাজিলাদের মতে তাও জায়েজ হবে না|

আশয়ারীদের মতানুযায়ী, তা জায়েজ হলেও বাস্তবে এমন কোন আদেশ আল্লাহ্ তায়ালা দেন নি| যেমন, মানুষকে শূন্যে ভাসার মত কোন আদেশ দেয়া হয়নি| ঈমান, ইবাদত ও আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দার নিকট এমন কিছু চান নি যা তাদের সামর্থ্যের বাইরে| এ কারণেই মুসলমান কেউ ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় কিংবা পাগল বা অজ্ঞান অবস্থায় ঈমানের তাসদীক্ না করা সত্ত্বেও তার মুসলমানিত্ব অটুট থাকে|

এই হাদিস শরীফে যে ঈমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা এর আভিধানিক অর্থে বিবেচনা করা উচিত নয়| কেননা, ঈমানের শাব্দিক অর্থ হল: সত্য হিসেবে মেনে নেয়া, বিশ্বাস করা| ঐ সময়ের আরব জাহিলদের মাঝে এর অর্থ জানে না এমন কেউ ছিল না| আর সম্মানিত সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইন্তো এর শাব্দিক অর্থ জেনেই থাকবেন| অথচ হযরত জিব্রাঈল আলিহিস্ সালাম, আসহাবে কিরামকে ইসলামে ঈমান বলতে কি বুঝায় তা শিখাতে চেয়েছিলেন| এ

জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন| কাশফ্ অথবা বিবেকের দ্বারা কিংবা দলিলের উপর ভিত্তি করে আকলের দ্বারা নির্ধারিত, নির্দিষ্ট ও পছন্দনীয় একটি কথাকে বুঝে, বিশ্বাস করে মেনে নিয়ে এর দ্বারা নির্দিষ্ট ছয়টি বিষয়কে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করাকে **ঈমান** বলে| রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নির্দিষ্ট ছয়টি মৌলিক বিষয়কে একত্রে বিশ্বাস করাকে ঈমান হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন| এ গুলো হল:

১. এই ছয়টি বিষয়ের প্রথমটি হল, **আল্লাহ্ তা'আলাকে একমাত্র ওয়াজিবুল উজুদ ও প্রকৃত মাবূদ এবং সমগ্র জগত এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা**| দুনিয়া ও আখিরাতে যা কিছু আছে তার সব কিছুই বস্তুহীন, সময়হীন ও নমুনাহীন অবস্থায় শূন্য থেকে অস্তিত্ব প্রদানকারী শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, এব্যাপারে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা| (তিনিই সকল বস্তুকে, অণু, পরমাণু, উপাদান, এককোষী, বহুকোষী, জড়, জীব, জীবন, মৃত্যু, সকল ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, সকল ধরণের শক্তি, ক্ষমতা, কানুন, গতিবিধি, রূহ, ফেরেশতাসহ যাবতীয় অস্তিত্বশীলকে শূন্য থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং প্রদত্ত অস্তিত্বে টিকিয়ে রেখেছেন|) জগতের সব কিছুকে (শূন্য থেকে এক মুহূর্তে) যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, একইভাবে (প্রতিটি মুহূর্তে একটিকে অপরটি থেকেও অস্তিত্ব দিচ্ছেন, যখন কিয়ামতের সময় হবে তখনও এক মুহূর্তে সব কিছুকে) পুনরায় বিলুপ্ত করবেন| তিনিই সবকিছুর প্রকৃত স্রষ্টা, অধিপতি, খালিক, মালিক, হাকিম| তাঁর কোন হাকিম, আমীর নাই|তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিংবা তাঁর সমকক্ষও কেউ নাই| যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব, মহৎ ও পরিপূর্ণ গুণাবলী শুধুমাত্র তাঁরই উপযুক্ত| তাঁর মাঝে কোন ধরণের ভুলত্রুটি, বিচ্যুতি বা অপরিপূর্ণ সিফাত নাই| যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন| কোন কিছু পাওয়ার আশায় কিংবা নিজের উপকারের জন্য কিছু করেন না| তথাপি তাঁর প্রতিটি কাজে হিকমত, ফায়দা, দয়া ও অনুগ্রহ নিহিত রয়েছে|

বান্দাদের জন্য ভালো কিছু করতে ও বান্দাদের মধ্য থেকে যারা উত্তম তাদেরকে পুরস্কৃত করতে, সওয়াব প্রদান করতে তিনি বাধ্য নন| একইভাবে মন্দদের আযাব দিতেও তিনি বাধ্য নন| অবাধ্যদের, পাপকর্ম

সম্পাদনকারীদের সবাইকে জান্নাতে স্থানে দিলে, তাও তাঁর সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহের প্রকাশ হিসেব যথাযথ হবে| আবার অনুগত ও ইবাদতকারীদের সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে, তাও তাঁর আদালতের প্রকাশ হিসেবে যথাযথ হবে| তথাপি তিনি ঘোষনা দিয়েছেন, মুসলমানদেরকে, তাঁর ইবাদতকারীদেরকে তিনি জান্নাতে স্থান দিবেন এবং সীমাহীন নিয়ামত ও অনুগ্রহ প্রদান করবেন| আর কাফিরদেরকে অনন্ত আযাব ভোগের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন| তিনি এরূপ ইচ্ছা করেছেন ও আমাদেরকে অবহিত করেছেন| তিনি কোনো ভাবেই তাঁর প্রতিশ্রুতির ভঙ্গকারী হন না| সমস্ত সৃষ্টি ঈমান গ্রহণ করলে, তাঁর আনুগত্য করলে তা তাঁর কোন উপকারে আসে না|একই ভাবে সমগ্র জগত কুফুরী করলে, অবাধ্য হলে তাও তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনা| বান্দা কিছু করতে চাইলে তা যদি তিনিও ইচ্ছা করেন তবেই তা করেন| বান্দার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি জিনিস তিনিই সৃষ্টি করেন| তিনি না চাইলে কোন কিছুই হয় না, কিছুই সৃষ্টি হয়না, কিছুই নড়াচড়া করতে পারে না| তিনি ইচ্ছা না করলে কেউ কাফির হতে পারে না, কেউ অবাধ্য হতে পারে না| কুফর বা গুনাহের ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছা থাকলেই তা হয় যদিও তিনি তা পছন্দ করেন না| তাঁর কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না| কেন এরূপ করলেন? ঐভাবে কেন করলেন না? এধরণের প্রশ্ন করার কিংবা কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার বা সাধ্য কারো নেই| শিরক ও কুফর ব্যতীত যেকোন কবীরা গুনাহ করে তওবাহীন অবস্থায় কেউ মারা গেলে, চাইলে তিনি তা ক্ষমা করে দিতে পারেন| আবার একটি সগীরা গুনাহের জন্যও চাইলে কাউকে আযাব দিতে পারেন| কিন্তু কাফির ও মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের তিনি কখনোই ক্ষমা করবেন না, তাদেরকে অনন্তকাল আযাব প্রদানের বিষয়ে তিনি ঘোষনা দিয়েছেন।| মুসলমান অর্থাৎ **আহলে কিবলা** ও ইবাদতকারী হওয়ার পরও যারা **আহলে সুন্নাতের** ইতিক্বাদের অনুসারী না এবং তওবা না করেই ঐ অবস্থায় মারা যায়, ঐসব **আহলে বিদাআত** মুসলমানরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করলেও তাদের এ শাস্তি চিরস্থায়ী হবে না|

আল্লাহ্ তা'আলাকে দুনিয়াতে শারীরিক চক্ষু দিয়ে দেখা সম্ভব| কিন্তু কেউ দেখতে পায় নি| কিয়ামতের দিবসে হাশরের ময়দানে তিনি কাফির ও গুনাহগার মুমিনদের কাহর্ ও জালাল্ রূপে আর সৎকর্মশীল

মুমিনদের লুত্ফ ও জামাল রূপে দেখা দিবেন| মুমিনগণ জান্নাতে তাঁর জামাল সিফাতের প্রকাশ দেখতে পাবেন| ফেরেশতা ও মহিলারাও তা দেখতে পাবেন। কাফিররা তাঁর এইরূপ দেখা থেকে বঞ্চিত হবে| জিনরাও তাঁকে দেখা থেকে মাহরুম হবে বলে শক্তিশালী হাদিস রয়েছে| অধিকাংশ আলেমের মতে, 'মাকবুল মুমিনগণ, প্রত্যেক ভোরে ও প্রত্যেক সন্ধ্যায়; যাদের মর্যাদা কম হবে তারা প্রত্যেক জুমার দিনে আর নারীরা দুনিয়ার ঈদের মত বছরে কয়েকবার আল্লাহ্ তা'আলার জামালের তাজাল্লী ও রু'ইয়তের দ্বারা পরম সৌভাগ্য অর্জন করবেন |

(হযরত শাইখ আব্দুল হক্ব দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি[3] তার '**তাকমিলুল ঈমান**' নামক কিতাবে বলেছেন যে হাদিস শরীফে আছে, "**কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের রবকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দেখতে পাবে**"| মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে দুনিয়াতে যেমন না বুঝেই জানা গেছে তেমনিভাবে আখেরাতে না বুঝেই দেখা যাবে| ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারী, ইমাম সুয়ুতী ও ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন' এর মত বিখ্যাত আলেমগণের মতে, ফেরেশতারা জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পাবেন| ইমাম-ই আজম হযরত আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন যে, জ্বিনরা সওয়াব অর্জন করে না তাই জান্নাতেও প্রবেশ করবে না, তবে মুমিন জ্বিনরা জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে| নারীরা দুনিয়ার ঈদের দিনগুলির মত বছরে কয়েকবার দেখতে পাবে| কামিল মুমিনগণ প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের সময়ে আর সাধারণ মুমিনগণ প্রতি জুমার দিনে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে| এই ফকীরের মতে, মুমিন নারীগণ, ফেরেশতাগণ ও মুমিন জ্বিনরাও এই সৌভাগ্য অর্জন করবে| হযরত ফাতেমা তুজ্ জোহরা, আম্মাজান হযরত খাদীজাতুল্ কুবরা ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুন্না এবং হযরত মরিয়ম ও হযরত আছিয়া আলাইহুমাস্ সালামের মত কামিল ও আরিফ নারীগণ অবশ্যই স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী বিশেষভাবে পুরস্কৃত হবেন| ইমাম সুয়ুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও এই বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেছেন|)

[3]হযরত আব্দুল হক্ব দেহেলেভী, ১০৫২ হিজরী (১৬৪২ খৃঃ) দিল্লীতে ইনতিকাল করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভের বিষয়টি বিশ্বাস করা উচিত তবে কিভাবে দেখা সম্ভব হবে তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়| কেননা আল্লাহ্ তা'আলার কাজ কর্ম আমাদের আকল দিয়ে বুঝা সম্ভব নয়| আর তা দুনিয়ার কর্মের সাথে সাদৃশ্যও রাখে না| (পদার্থ ও রসায়নের জ্ঞান দিয়ে তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়) এসবের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কোনো সম্পর্ক নেই| আল্লাহ্ তায়ালা কোন বস্তু বা উপাদান নন| (যৌগিক বা মৌলিক পদার্থ নন) | তাঁকে হিসাব করা, গণনা করা বা পরিমাপ করা সম্ভব নয়| তাঁর মাঝে কোন পরিবর্তন নেই| তিনি স্থান, কাল বা পাত্রের সাথে সম্পর্কিত নন| তাঁর জন্য পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বলে কিছু নাই| তাঁর সামনে, পিছনে, উপরে, নিচে, ডানে, বামে বলতে কিছু নাই| এ কারণেই, মানুষের চিন্তা ও কল্পনা শক্তি তাঁর কোন কিছুই প্রকৃত অর্থে বুঝার সামর্থ্য রাখে না| তাই তাঁকে কিভাবে দর্শন করা যাবে তাও অনুধাবন করতে পারে না| হাত, পা, দিক, স্থান বা এর মত যে সব কালিমা তাঁর জন্য বলা জায়েজ নয় কিন্তু বিভিন্ন আয়াতে করীমায়ও হাদিস শরীফে এসেছে তা আমরা দৈনন্দিন যে অর্থে ব্যবহার করি সে অর্থে নয়| এই ধরণের আয়াতে করীমা ও হাদিস শরীফকে '**মুতাশাবিহাত**' বলা হয়| এগুলি যেভাবে আছে সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে, তবে এর প্রকৃতি কি বা কেমন সে ব্যাপারে মাথা ঘামানো উচিত নয়| অথবা একে '**তাওয়ীল** 'করা হয়| অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শানের উপযুক্ত কোন অর্থ প্রদান করা হয়| যেমন, হাত শব্দটিকে কুদরত, ক্ষমতা বা শক্তি অর্থে বুঝা উচিত|

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে মিরাজের রজনীতে দেখেছিলেন| তবে এই দেখা, দুনিয়াবী শারীরিক চক্ষুর মাধ্যমে ছিল না| কেউ যদি বলে, আমি দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছি তবে সে পথভ্রষ্ট হবে| আওলিয়া কাদ্দাসাল্লাহু তায়ালা আসরারাহুম আজমাইন এর দেখা দুনিয়া বা আখেরাতের দেখার মত নয়| অর্থাৎ এই দেখা '**রু'ইয়াত**' নয়; বরং তারা '**শুহুদ**' অর্জন করেছিলেন| (অর্থাৎ ক্বালবের চোখ দিয়ে তাঁর 'মিছাল'কে দেখেছে|) আওলিয়া-ই কিরামদের মাঝে অনেকেই বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছি| তাদের এই কথা 'সাক্‌র' অবস্থায় বলা হয়েছে|

অর্থাৎ আকলের অকার্যকর থাকা অবস্থায়, শুহুদকে রু'ইয়াত ভেবে বলেছে| অথবা এই ধরণের কথাকে তাওয়ীল করে বুঝতে হবে|

প্রশ্ন: উপরে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'আলাকে দুনিয়ার চোখ দিয়ে দেখা জায়েজ| তাহলে জায়েজ কোন কিছু সম্পর্কে কেউ অর্জনের দাবী করলে কেন তাকে 'জিনদিক' বলা হবে? এরূপ অর্জনের দাবীকারীকে যদি কাফির বলা হয় তবে সেই বিষয়টিকে কিভাবে জায়েজ বলা যায়?

জবাব: প্রথমত অভিধানে জায়েজ বলতে, কোন কিছুর হওয়া বা না হওয়া উভয়টিই সম্ভবকে বুঝায়| আশয়ারী[4] মাজহাব অনুযায়ী, রু'ইয়াত জায়েজ বলতে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্ তায়ালা চাইলে দুনিয়াবী কানুনের বাইরের কোন দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টি করে দেখা দিতে সক্ষম| উদাহরণ স্বরূপ, চীনে অবস্থানরত কোন অন্ধ ব্যক্তিকে আন্দালুসে অবস্থিত কোন মশাকে দেখার ক্ষমতা দিতে পারেন অথবা পৃথিবীতে অবস্থারত কাউকে চাঁদে বা তারায় কিছু দেখার ক্ষমতা দিতে পারেন। আল্লাহ্ তায়ালা যা ইচ্ছা করেন তাই করতে সক্ষম| দ্বিতীয়ত, "আমি আল্লাহ তায়ালাকে দুনিয়াতে দেখেছি" বললে তা পবিত্র কুরআন মজিদের আয়াতে করীমার ও আলেমগণের ইজমার বিরুদ্ধচারণ করা হবে| এ জন্যই এরূপ দাবীকারীকে **মুলহিদ** অথবা **জিনদিক** বলা হয়েছে| (**মুলহিদ** ও **জিনদিক** নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে| **মুলহিদ** এ ব্যাপারে আন্তরিক| নিজেকে মুসলমান মনে করে, সঠিক পথের অনুসারী ভাবে| কিন্তু **জিনদিক** হচ্ছে ইসলামের শত্রু| তারা ইসলামের মাঝে থেকে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার জন্য নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করে|) তৃতীয়ত, দুনিয়াতে রু'ইয়াত জায়েজ বলতে জাগতিক উপায়ে দেখা সম্ভবের কথা বুঝানো হয়নি| অথচ যারা দেখেছি বলে, তারা দুনিয়ার চোখের দেখার কথাই বুঝিয়ে থাকে| যা জায়েজ নয় অর্থাৎ সম্ভব নয়| কুফরের কারণ হয় এমন কথা কেউ বললে তাকে মুলহিদ বা জিন্দিক বলা হবে। (হযরত মাওলানা খালিদ রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা), এই জবাবের পরে বলেন যে, 'সতর্ক হও!'এর দ্বারা মূলত দ্বিতীয় জবাবের অধিক গ্রহণীয় হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন|)

[4]হযরত আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আশয়ারী, ৩৩৩ হিজরী (৯৪১ খৃস্টাব্দে)বাগদাদে ইনতিকাল করছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে রাত, দিন কিংবা সময়কে সম্পর্কিত করার কথা ভাবা যায় না| যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার জন্য পরিবর্তনের কথা ও ভাবা যায় না| এ কারণে, তিনি অতীতে এরূপ ছিলেন বা ভবিষ্যতে এরূপ হবেন , এধরনের কিছুই বলা যাবে না| আল্লাহ্ তায়ালা কোন কিছুর মাঝে 'খুলুল' করেন না| (শিয়াদের মধ্য থেকে **নুসাইরী** নামক ফিরকা এই আক্বীদার কারণে কাফির হয়ে যায় যে, তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহুর মাঝে খুলুল করেছেন|) তিনি কোন কিছুর সাথে মিশ্রিতও হন না| আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিরোধী, শরীক, অংশীদার, সমকক্ষ, সাহায্যকারী, রক্ষাকারী নাই| তাঁর বাবা, মা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী বলতেও কিছু নাই| তিনি সর্বক্ষণ ও সর্ববস্থায় সকলের নিকট হাজির এবং সব কিছুর নিয়ন্ত্রক ও পরিদর্শক| প্রত্যেকের কাছেই তিনি তাদের ধমনীর চেয়েও কাছের। কিন্তু তাঁর এই হাজির হওয়া, সর্বব্যাপী হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া আমরা যে অর্থে বুঝি সে অর্থে নয়| তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি আলেমদের ইলমের মাধ্যমে, বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের দ্বারা ও আওলিয়া-ই কিরামের কাশ্ফ ও শুহুদের দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়| মানুষের আকল এর মর্মার্থ বুঝতে অক্ষম| আল্লাহ্ তা'আলা যাত ও সিফাতে একক সত্তা| এর কোনটিতেই পরিবর্তন, বিবর্তন নাই| তাফাক্কারু ফি আলাইল্লাহ ওয়ালা তাফাক্কারু ফি জাতিল্লাহ| এই বিষয়ে মাকতুবাত কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৪৬ নম্বর মাকতুব পড়ুন|

আল্লাহ্ তা'আলার ইসম্সমূহ '**তাওকিফী**' | অর্থাৎ ইসলাম যে নামসমূহ আমাদেরকে অবহিত করেছে তা বলা জায়েজ, এর পরিবর্তে অন্য নাম বলা জায়েজ নয়| (যেমন, ইসলামে আল্লাহ্ তা'আলার ইসম হিসেবে আলীম বলেছে| এখন এর কাছাকাছি অর্থের ফকিহ নামটি এর বদলে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য বলা যাবে না| কেননা ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলাকে ফকিহ নাম দেয়নি| একইভাবে আল্লাহ্ নামের স্থানে দেবতা বা উপাস্য ইত্যাদি বলা জায়েজ হবে না; যেমন হিন্দুদের দেবতা হল ষাড়| তবে 'আল্লাহ্ হলেন এক, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই 'বলা যাবে| অন্য ভাষার ডিইউ, গট, গড ইত্যাদি শব্দ ইলাহ্, মাবূদ অর্থে ব্যবহার করা যাবে| কিন্তু আল্লাহ্ নামের বদলে ব্যবহার করা যাবে না|)

আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য ইসম্ রয়েছে| মশহুর মত হল এক হাজার একটি ইসম্ রয়েছে| অর্থাৎ তাঁর নামসমূহ থেকে এক হাজার

একটি নাম মানুষকে জানানো হয়েছে| হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিরানব্বইটি নাম অবহিত করেছেন| এগুলিকে '**আসমাউল হুসনা**' বলা হয়|

আল্লাহ্ তা'আলার ছয়টি '**সিফাত-ই যাতিয়্যা**' রয়েছে| (যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে|) **মাতুরিদী** মাজহাব অনুযায়ী তাঁর আটটি '**সুবুতী সিফাত** 'রয়েছে| **আশয়ারী** মাজহাব অনুযায়ী এর সংখ্যা সাতটি| এই সিফাতগুলিও তাঁর যাতের মত অনাদি ও অনন্ত| সৃষ্টির সিফাতের মত নয়| আকল বা কল্পনার দ্বারা, দুনিয়ার ঐ ধরণের সিফাতের সাথে তুলনা করে তাঁর সিফাতসমূহ বুঝা অসম্ভব| আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সিফাতসমূহ থেকে একেকটি নমুনা মানুষকে দান করেছেন| যাতে মানুষ এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সিফাতসমূহকে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে| যেহেতু মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে কল্পনা করতে পারেনা, তাই আল্লাহ তায়ালাকে চিন্তা করা বা এর চেষ্টা করা জায়েজ নয়। আল্লাহ্ তা'আলার এই আটটি সুবুতী সিফাত তাঁর যাতের 'আইনী'ও নয়, 'গাইরী'ও নয়| অর্থাৎ এই সিফাতসমূহ তাঁর যাত এর সৃষ্টি করে না, আবার সিফাতসমূহ তিনি ব্যতীত অন্য কিছুও নয়| এই আটটি সিফাত হল:

হায়াত (চিরঞ্জীব), **ইলম** (সর্বজ্ঞাত), **সাম** (শ্রবণ), **বাছার** (দৃষ্টি), **কুদরত** (সর্বশক্তিমান), **কালাম** (কথা), **ইরাদা** (ইচ্ছা) ও **তাকবীন** (সৃজনী)| আশয়ারী মাজহাব অনুযায়ী, তাকবীন ও কুদরত সিফাতকে এক ধরা হয়েছে| আর মাশিয়াতকে ইরাদা বলা হয়েছে|

আল্লাহ্ তা'আলার আটটি সিফাতের প্রত্যেকটি পরম অর্থ বহন করে ও একক অবস্থায় বিদ্যমান| কোনটিতেই কোন ধরনের পরিবর্তন হয় না| কিন্তু মাখলুকের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার বিবেচনায় প্রত্যেকটিই অসংখ্য হয়| একটি সিফাতের, মাখলুকের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার বিবেচনায় অসংখ্য হওয়াটা এর পরম হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা নয়| এর মতই আল্লাহ্ তায়ালা এত ধরণের মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকটিকে, প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বে টিকিয়ে রেখেছেন তথাপি তিনি এক| এর দ্বারা তাঁর সিফাতের মাঝেও কোন পরিবর্তন হয় না| প্রতিটি সৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে টিকে থাকার জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী| কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন|

২. যে ছয়টি বিষয়ে ঈমান গ্রহণ করা আবশ্যক তার দ্বিতীয়টি হল : **তাঁর ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা**| আরবীতে একে '**মালাক**' বলা হয়| এর অর্থ হল: দূত, খবর সরবরাহকারী অথবা শক্তি| ফেরেশতারা নূরানী সৃষ্টি ও জীবনের অধিকারী| তারা অতি সূক্ষ্ম উপাদানে (লাতিফ্) তৈরী| মানুষের মাঝে যে মন্দ রিপু রয়েছে, ফেরেশতাদের মাঝে তা নেই| তারা যেকোনো আকৃতি ধারণ করতে পারে| গ্যাস যেমন তরল ও কঠিনে রূপান্তর হতে পারে এবং কঠিন অবস্থায় আকৃতি ধারণ করতে পারে, তেমনি ফেরেশতারা সুন্দর আকৃতি ধারণ করতে পারে। ফেরেশতারা, বুজুর্গ ব্যক্তিদের দেহ থেকে আলাদা হওয়া রূহ নয়| খ্রিস্টানরা এরূপ ধারণা করে থাকে| ফেরশতারা বস্তুহীন কোন শক্তিও নয়| প্রাচীন দার্শনিকদের কেউ কেউ এরূপ ধারণা করত| 'মালাক' এর বহুবচন '**মালাইকা**'| ফেরেশতাদেরকে জীবন ধারণকারীদের মধ্যে সর্ব প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে| এজন্য, কিতাবের প্রতি ঈমান আনার পূর্বে ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে| আর পয়গম্বরদের পূর্বে কিতাবের কথা বলা হয়েছে| কুরআন করীমে, আবশ্যকীয় বিশ্বাসের বিষয়গুলিকে এই ক্রমধারা অনুযায়ীই বর্ণিত হয়েছে|

ফেরেশতাদের উপর ঈমান এরূপ হওয়া উচিত: ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও বান্দা, তাঁর অংশীদার নয় | তাঁর কন্যাও নয়, কাফির ও মুশরিকরা যেরূপ ধারণা করে থাকে| আল্লাহ্ তায়ালা সকল ফেরেশতাকে পছন্দ করেন| তারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের পরম আনুগত্য করে| কোন ধরণের গুনাহ সম্পাদন করেন না| কোন আদেশের বিরোধিতাও করেন না| তারা পুরুষ বা নারী নন| তারা বিবাহ করেন না, সন্তানও জন্ম দেন না| হায়াতের অধিকারী ও জীবন্ত| যদিও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর এক বর্ণনায় আছে যে কিছু ফেরেশতাদের সন্তান আছে যাদের মধ্যে শয়তান ও জ্বীন রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা যখন মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন তখন ফেরেশতারা বলেছিল, "ইয়া রব! আপনি কি এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন যারা ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদে লিপ্ত হবে ও রক্তারক্তি করবে?" এরূপ বলে যে সওয়াল করা হয়, তাকে '**জাল্লা**' বলা হয়| এধরণের প্রশ্নে তাদের মাসুম তথা নিষ্পাপ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি সাধন করেনা|

সংখ্যাধিক্যের বিবেচনায় ফেরেশতারাই সেরা মাখলুক| আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত কেউই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা রাখে না | মহাশূন্যে, ফেরেশতাদের ইবাদত করা হয়নি এমন কোন খালি স্থান বিদ্যমান নাই| মহাকাশের প্রতিটি স্থানে রুকু ও সিজদাকারী ফেরশতাদের দ্বারা পরিপূর্ণ| আসমানে, জমিনে, ঘাসে, তারায়, নক্ষত্রে, জড় ও জীবে, বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটায়, বৃক্ষের প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি অণু ও পরমাণুতে, প্রতিটি ক্রিয়া- বিক্রিয়ায় অর্থাৎ, সব কিছুতেই ফেরেশতারা প্রদত্ত দ্বায়িত্ব পালন করে থাকেন| সর্বত্র আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালন করেন| মূলত তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে এক মাধ্যম| তাদের কেউ অন্য ফেরেশতাদের সর্দার, কেউ পয়গম্বরদের নিকট ওহী বহন করেন, কেউবা মানুষের ক্বলবে সৎ চিন্তার উদ্রেক করেন, যাকে **ইলহাম** বলা হয়| আবার এমনও অনেক ফেরেশতা আছেন, যাদের মানুষ বা অন্য সৃষ্টি সম্পর্কে কোন ধারণাই নাই| কেউবা আল্লাহ্ তা'আলার জামাল দেখে আত্মহারা হয়ে আছেন| প্রত্যেক ফেরেশতারই নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে| তারা কখনোই তাদের দায়িত্ব পালন থেকে মুহুর্তের জন্যও বিচ্যুত হন না| তাদের কারো দুইটি, কারো চারটি অথবা আরো অধিক ডানা রয়েছে| (প্রতিটি পাখির ও উরীজাহাহের তাদের নিজস্ব গঠনের ডানা রয়েছে, তেমনি ফেরেশতাদেরও তাদের নিজস্ব আকৃতির ডানা রয়েছে। যখন আমরা অজানা কিছু শুনি, তখন জানা কিছুর সাথে তুলনা করে বুঝতে চেষ্টা করি, এভাবেই প্রতারিত হয়| ফেরেশতাদের ডানা আছে তা বিশ্বাস করি, কিন্তু এর প্রকৃতি কি তা আমাদের অজানা| খ্রিস্টানদের চার্চে, সাহিত্যে কিংবা সিনেমায় নারীরূপী ফেরেশতার ছবি অঙ্কিত আছে| এ সবকিছুই ভ্রান্ত। মুসলমানরা এসব ছবি অঙ্কন করেনা। অমুসলিমদের অঙ্কিত এসব অবাস্তব ছবি সত্য বলে মেনে নেয়া আমাদের উচিত নয় এবং ইসলামের শত্রুদের বিশ্বাস করা উচিত নয়|)

জান্নাতের ফেরেশতারা জান্নাতে অবস্থান করেন| তাদের সর্দারের নাম হল **রিদওয়ান**| জাহান্নামে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের '**জাবানী**' বলা হয়| তারা সেখানে আদিষ্ট দ্বায়িত্ব পালনে রত থাকেন| জাহান্নামের আগুন তাদের কোন ক্ষতি করে না, যেমন মাছ পানিতে কষ্ট পায় না| জাবানীদের মাঝে উনিশ জন বড় ফেরেশতা আছেন| তাদের সর্দারের নাম '**মালিক**'|

প্রত্যেক মানুষের ভাল ও মন্দ সকল কাজ লিপিবদ্ধ করার জন্য রাতে দুজন, দিনে দুজন এভাবে মোট চারজন ফেরেশতা দ্বায়িত্বে নিয়োজিত আছেন| এদেরকে '**কিরামান কাতিবিন**' বা '**হাফাজা**' ফেরেশতা বলা হয়| অন্য বর্ণনানুযায়ী, হাফাজা ফেরেশতা কিরামান কাতিবীন থেকে আলাদা। ডান কাঁধের ফেরেশতা ভালো কাজসমূহ লেখেন। একই সাথে তিনি বাম কাঁধের ফেরেশতার পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন| বামের ফেরেশতা মন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করেন| কবরে প্রশ্নকারী এবং কাফির ও পাপী মুসলমানদের শাস্তি প্রদানকারী ফেরেশতা রয়েছেন| কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতাদের '**মুনকার** ও **নাকির**' বলা হয়| মুমিনদেরকে যারা প্রশ্ন করবেন তাদেরকে '**মুবাশশির** ও **বশির**' ও বলা হয়|

ফেরেশতাদের মাঝে মর্যাদার দিক দিয়ে পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান| তাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী চারজন ফেরেশতা রয়েছেন| তাদের প্রথমজন হলেন, হযরত **জিবরাঈল** আলাইহিস্ সালাম: তাঁর দায়িত্ব হল নবী-রাসূলদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার **ওহী** বহন করে নিয়ে আসা| তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে অবহিত করা| দ্বিতীয়জন হলেন হযরত **ইসরাফিল** আলাইহিস্ সালাম: '**সূর**' বা শৃঙঘায় ফুঁৎকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশতা| তিনি দু'বার ফুঁৎকার দিবেন। তাঁর প্রথম ফুঁৎকারের আওয়াজ যারা শুনতে পাবে, আল্লাহ্ ব্যতীত জীবন্ত যা কিছু আছে তাদের সবাই মৃত্যু বরণ করবে| দ্বিতীয় ফুঁৎকারের আওয়াজ শুনে সমস্ত জীবের পুনর্জাগরণ হবে| তৃতীয়জন হলেন হযরত **মিকাঈল** আলাইহিস্ সালাম: রিজিক সরবরাহ করা, প্রাচুর্য কিংবা দূর্ভিক্ষের ব্যবস্থা (ইকতিছাদী নিজাম) করা, (প্রশান্তি ও স্বস্তি আনা) এবং প্রতিটি বস্তুর মাঝে গতির সঞ্চার করা ইত্যাদি তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত| চতুর্থজন হলেন হযরত **আজরাঈল** আলাইহিস্ সালাম: তিনি মানুষের জান কবজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা| (ফারসী ভাষায় রূহকে জান বলা হয়|) উনাদের পরে আরো চার শ্রেণীর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতা রয়েছেন| '**হামালা-ই আরশ**' বা আরশ বহনকারী চারজন ফেরেশতা রয়েছেন, কিয়ামতের দিন যারা আটজন হবেন| হুজুর-ই ইলাহী বা আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাদেরকে '**মুকাররাবুন**' বলা হয়| আজাব প্রদানকারী

ফেরেশতাদের '**কারুবিয়ান**' আর রহমতের ফেরেশতাদের '**রুহানিয়ান**' বলা হয়| এদের সবাই 'খাওয়াস' তথা বিশেষ ও শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা| তারা, পয়গম্বরগণ বাদে সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ| আওলিয়া ও সালিহ মুসলমানগণ সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী| আবার সাধারণ ফেরেশতাগণ সাধারণ মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান| আর কাফিররা সকল সৃষ্টির চেয়ে অধম|

শৃঙ্ঘায় প্রথম ফুঁৎকারে, বড় চার ফেরেশতা ও হামালা-ই আরশগণ ব্যতীত অন্য সকল ফেরেশতাও অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে| এরপর হামালা-ই আরশ, তাদের পর চারজন প্রধান ফেরেশতাও বিলুপ্ত হবেন| দ্বিতীয় ফুঁৎকারে, প্রথমে সকল ফেরেশতাগণ জাগ্রত হবেন| হামালা-ই আরশ ও চার বড় ফেরেশতা দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পূর্বেই জাগ্রত হবেন| এর অর্থ দাঁড়ায়, যেভাবে এই ফেরেশতাগণ সকল প্রাণীর পূর্বে সৃষ্ট হয়েছেন, তেমনিভাবে সকল জীবের পরেই তাঁদের মৃত্যু হবে|

৩. ঈমান গ্রহণ আবশ্যক এমন ছয়টি বিষয়ের তৃতীয়টি হল: **আল্লাহ্ তায়ালা যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন সেগুলিকে বিশ্বাস করা**| মহান আল্লাহ্ তায়ালা এই কিতাবসমূহকে কতিপয় পয়গম্বরের প্রতি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম মারফত ওহী হিসেবে প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ পাঠ করিয়েছেন, কোন পয়গম্বরের প্রতি 'লাওহা' বা ফলকে লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়েছেন আর কোন পয়গম্বরের প্রতি ফেরেশতাদের মাধ্যমে না পাঠিয়ে সরাসরি গায়েবী আওয়াজের মাধ্যমে শুনিয়ে নাজিল করেছেন| এগুলির সবই আল্লাহ্ তা'আলার কালামের অন্তর্ভুক্ত| এই বিবেচনায় তা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী এবং মাখলূকের অন্তর্ভুক্ত নয়| এগুলি কোন ফেরেশতা কিংবা পয়গম্বরের নিজের কথা নয়| আল্লাহ্ তা'আলার কালাম, আমরা যা লিখি বা মনে ধারণ করি কিংবা মুখে বলি সেরূপ কোন কালাম নয়| তাঁর কালাম কোন বর্ণ বা আওয়াজ নয়| আল্লাহ্ তা'আলার সিফাতসমূহের প্রকৃতি মানুষের পক্ষে বুঝা অসম্ভব| কিন্তু ঐ কালাম যখন মানুষের নিকট আসে তখন তা পড়া যায়, লিখা যায় এবং মুখস্তও করা যায়| ঐ কালাম আমাদের সাথে হলে 'হাদিস 'হয়| অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার কালামের দুইটি রূপ রয়েছে; মানুষের সাথে থাকলে মাখলুক ও হাদিস হয়| আল্লাহ্ তা'আলার কালাম হিসেবে 'কাদিম' হয়|

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের সবগুলিই হক্ব ও সঠিক| এতে কোন মিথ্যা বা ভুল হতে পারে না| আযাব দিব বলে ক্ষমা করে দেয়াটা জায়েজ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও তা আমাদের না জানা কোন শর্ত অথবা তাঁর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত| কিংবা এর অর্থ হবে, বান্দা আযাবের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করে দেন| আযাব বা শাস্তির ঘোষণাকারী কালাম, কোন কিছুর ব্যাপারে খবর প্রদানের জন্য নয়, তাই তিনি ক্ষমা করে দিলে তা মিথ্যা হবেনা| [আল্লাহ্ তায়ালা যে সবের ওয়াদা করেছেন, সে সব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করা জায়েজ না হলেও, তাঁর পক্ষে আযাবসমূহ ক্ষমা করে দেয়া জায়েজ হয়| আকল ও আয়াতে করীমা এরূপ হওয়ার প্রতিই নির্দেশ করছে|]

কোন অসঙ্গতি বা সমস্যা না থাকলে, আয়াতে করীমা ও হাদিস শরীফের স্পষ্ট অর্থই প্রদান করতে হয়| সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কোন অর্থ প্রদান করা জায়েজ নয়| (কুরআন করীম ও হাদিস শরীফ কুরাইশের ভাষা ও উপভাষায় বর্ণিত হয়েছে| কিন্তু এদের কালিমার অর্থ প্রদানের সময়, চৌদ্দশত বছর পূর্বে হিজাজে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থই প্রদান করতে হবে| সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হওয়া বর্তমানের অর্থ দিয়ে অনুবাদ করা সঠিক নয়|) **মুতাশাবিহ** নামক আয়াতে করীমাগুলিতে আমাদের বোধ শক্তির উর্ধ্বের গোপন অর্থ রয়েছে| এগুলির অর্থ কেবল মাত্র আল্লাহ্ তায়ালা জানেন, আর তিনি যাদেরকে **ইলমে লাদুন্নী** দান করেছেন, সে সকল কতিপয় নির্বাচিত বুজুর্গ ব্যক্তি ও আল্লাহ্র অলীগন তাদেরকে যতটুকু জানানো হয়েছে ততটুকু জানতে পারেন| অন্য কারো পক্ষে তা বুঝা সম্ভব নয়| একারণে, মুতাশাবিহ আয়াতসমূহকে আল্লাহ্র কালাম হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু এর অর্থ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়| আশয়ারী মাজহাব অনুযায়ী তার সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিতভাবে **তাওয়ীল** করা জায়েজ| তাওয়ীল মানে, কোন কালিমার বিভিন্ন অর্থের মধ্য থেকে মশহুর নয় এমন অর্থকে গ্রহণ করা| উদাহরণস্বরূপ, সূরা ইসরার নিম্নোক্ত আয়াতে করীমাটি (তাফসীর আলেমদের প্রদত্ত অর্থ) "**আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর ছিল**" আল্লাহ্ তা'আলার কালাম হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে| আল্লাহ্ তায়ালা এর দ্বারা যাই মুরাদ করেছেন সেভাবেই বিশ্বাস করেছি বলা উচিত| এর অর্থ আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, আল্লাহ্ ও

তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভাল জানেন, বলাটা হল উত্তম পন্থা| অথবা এভাবে তাওয়ীল করা যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইল্‌ম যেমন আমাদের মত নয়, তাঁর ইরাদা যেমন আমাদের মত নয়, তেমনি ভবে তাঁর হাতও সৃষ্টির হাতের মত নয়|

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবসমূহে, কিছু আয়াতের শুধুমাত্র তিলাওয়াত কিংবা শুধুমাত্র অর্থ অথবা উভয়ই এক সাথে **'নাসখ'** করা হয়েছে| সর্বশেষ আসমানী কিতাব হল কুরআন করীম| কুরআন করীমকে প্রেরণ করার পরে, পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাবের হুকুম 'নাস্‌খ' হয়ে গেছে| কুরআন করীমে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে| এতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাধিত হবেনা| পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইলম কুরআনের মাঝে নিহিত আছে| এ কারণেই কুরআন অন্যান্য আসমানী কিতাবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অধিক মূল্যবান| রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় মুজিযা হল এই কুরআন করীম| সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতি একত্রিত হয়ে পবিত্র কুরআনের একটি সংক্ষিপ্ত সূরার অনুরূপ কিছু রচনা করার চেষ্টা করলেও তাতে সফল হবেনা| তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, ভাষাবিদরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু একটি সংক্ষিপ্ত আয়াতের অনুরূপও রচনা করতে সক্ষম হয়নি| আল্লাহ্ তায়ালা ইসলামের দুশমনদেরকে কুরআন করীমের দ্বারা পরাভূত করেছেন| কুরআন করীমের বালাগাত মানুষের সাধ্যাতীত| মানুষের পক্ষে এর মত করে বলা অসম্ভব| কুরআন করীমের আয়াতসমূহ, মানুষের রচিত ছন্দ, পদ্য কিংবা গদ্যের মত নয়| একই সাথে আবার এই কুরআন করীম, আরব দেশের সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত হরফসমূহের দ্বারাই নাযিল হয়েছে|

আসমানী কিতাবসমূহের মধ্য থেকে আমাদেরকে একশ চারটির ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে| এগুলির মধ্য থেকে দশটি 'সুহুফ' হযরত **আদম** আলাইহিস্ সালামকে, পঞ্চাশটি সুহুফ হযরত শীশ (**শিত্**) আলাইহিস্ সালামকে, ত্রিশটি সুহুফ হযরত **ইদ্রিস** আলাইহিস্ সালামকে ও বাকী দশটি সুহুফ হযরত **ইবরাহীম** আলাইহিস্ সালামকে প্রদান করা হয়েছে| এছাড়া হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি '**তাওরাত**', হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের প্রতি '**যাবুর**', হযরত

ঈসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি '**ইনজিল**' ও সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি **কুরআন করীম**কে নাযিল করা হয়েছে|

একজন মানুষ কোন আদেশ কিংবা নিষেধ করার জন্য অথবা কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য বা কোন খবর প্রদানের জন্য ইচ্ছা করলে, প্রথমে তা মনে মনে চিন্তা করে, সাঁজায় ও প্রস্তুত করে| মনের মাঝে থাকা এই অর্থকে '**কালাম-ই নাফসী**' বলা হয়| যাকে আরবী, ফারসী, ইংরেজি বা অন্য কোন ভাষার সাথে সম্পর্কিত করা যায় না| এই ভাবকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করলে বিভিন্ন অর্থ বহন করবে না| মনের ঐ অর্থকে ভাষায় প্রকাশ করলে তাকে '**কালাম-ই লাফজী**' বলা হয়| কালাম-ই লাফজী বিভিন্ন ভাষার হতে পারে| এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কালাম-ই নাফসী হল অন্যান্য সিফাত যেমন জ্ঞান, ইচ্ছা, বাস্র ইত্যাদির মত সত্ত্বার মাঝেই নিহিত, পৃথক একটি সিফাত যা অপরিবর্তনশীল| আর কালাম-ই লাফজী হল, ঐ কালাম-ই নাফসীকে প্রকাশকারী ও মানুষের কানে শোনা ও মুখ দিয়ে বলা হরফের সমষ্টি| অতএব আল্লাহ্ তা'আলার কালাম চিরন্তন, যা কোন মাখলুক নয়, যাতের মাঝে নিহিত অনাদি ও অনন্ত এক সিফাত| যা সিফাতে যাতিয়্যা থেকে ও ইলম, ইরাদা এর মত সিফাতে সুবুতিয়্যা থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র একটি সিফাত|

কালাম সিফাতটি পরম ও মৌলিক| এর কোন হরফ বা আওয়াজ নেই| আদেশ, নিষেধ, খবর প্রদানের মত কিংবা আরবী, ফারসী, ইবরানী, সুরিয়ানী ইত্যাদির মত ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণকারী নয়| আল্লাহ্ তা'আলার কালাম অবিভাজ্য| এর কোন কাঠামো নেই, তাই লেখা সম্ভব নয়| এর জন্য মস্তিষ্ক, কান বা জিহ্বার মত কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নাই| যে ভাষাতেই ইচ্ছা প্রকাশ করা সম্ভব| এভাবেই আরবী ভাষায় বলা হলে তাকে কুরআন করীম বলা হয়, ইবরানী ভাষায় হলে তাওরাত আর সুরিয়ানী ভাষায় হলে 'ইনজিল' বলা হয়| ('**শারহুল মাকাসিদ্**' [5]কিতাবে গ্রীক ভাষায় ইনজিল আর সুরয়ানী ভাষায় হলে 'যাবুর' বলা হয়েছে|)

কালাম-ই ইলাহী আমাদেরকে অনেক কিছু অবহিত করে| পূর্বে সংঘটিত বা ভবিতব্য কোনো ঘটনার বর্ণনা করলে তাকে '**খবর**' বলা

[5]শারহুল মাকাসিদ কিতাবটি সাদ্ উদ্দিন তাফতাযানী রচনা করেছেন ।তিনি ৭৯২ হিজরীতে (১৩৮৯ খৃস্টাব্দে) সমরকন্দে ইনতিকাল করেছেন।

হয়| এরূপ না হলে তাকে '**ইনশা**' বলা হয়| কোন কিছু করার আদেশ বুঝালে তাকে '**আমর্**' আর কিছু করা থেকে নিষেধ করলে তাকে '**নাহি**' বলা হয়| কালাম-ই ইলাহীর মাঝে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয় না| নাযিলকৃত সমস্ত আসমানী কিতাব ও সাহিফাসমূহ, আল্লাহ্ তা'আলার কালাম সিফাত থেকে আগত| কালাম সিফাত থেকে অর্থাৎ, **কালাম-ই নাফসী**র থেকে আগত| আরবী হরফে নাযিলকৃত ওহীকেই কুরআন করীম বলা হয়| হরফে ভর করা, যা লেখা যায়, বলা যায়, শুনা যায় ও মুখস্ত করা যায় এমন সারিবদ্ধভাবে নাযিল হওয়া ওহীকে **'কালাম-ই লাফজী'** বা **'কুরআন করীম'** বলা হয়| এই কালাম-ই লাফজী, কালাম-ই নাফসীর প্রতি নির্দেশ করে বিধায় একেও কালাম-ই ইলাহী বা সিফাত-ই ইলাহী বলা জায়েজ| এর সম্পূর্ণটিকে একত্রে কুরআন করীম বলা হয়, একইভাবে এর কোন অংশ বা আয়াতকেও কুরআন বলা হয়|

কালাম-ই নাফসী যে মাখলুক নয়, বরং অন্যান্য সিফাতের মতই কাদিম সে ব্যাপারে সত্যপন্থী আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন| তবে কালাম-ই লাফজী হাদিস না কাদিম এ ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে| তবে যে সকল আলেম কালাম-ই লাফজীকে হাদিস হিসেবে গণ্য করেছেন, তারাও এটাকে হাদিস বলতে বলতে নিষেধ করেছেন| কেননা এর দ্বারা মানুষ কালাম-ই নাফসীকেও হাদিস ভাবতে পারে| এটিই সর্বাধিক উপযুক্ত কথা| মানুষের চিন্তা শক্তি, কোন কিছুর প্রতি নির্দেশকারী কিছু শুনলে, তৎক্ষণাৎ ঐ জিনিস কল্পনা করে| আহলে সুন্নাত আলেমদের মধ্য থেকে কুরআন করীমকে যারা হাদিস বলেন তারা এর দ্বারা, আমাদের মুখ দিয়ে কুরআনের যে আওয়াজ বা হরফ উচ্চারিত হয় তাকে বুঝাতে চেয়েছেন| আর তা মাখলুক| তবে আহলে সুন্নাত আলেমগণ এব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে কালাম-ই লাফজী ও কালাম-ই নাফসী উভয়ই আল্লাহ্র কালাম হিসেবে বিবেচিত| এই কথাকে অনেকে মাযাজ হিসেবে গ্রহণ করলেও, এখানে কালাম-ই নাফসী আল্লাহ্ তা'আলার কালাম বলতে, আল্লাহ্ তা'আলার কালাম সিফাতকে বুঝানো হয়েছে| আর কালাম-ই লাফজী আল্লাহ্ তা'আলার কালাম বলতে, আল্লাহ্ তায়ালা এর খালেক তা বুঝানো হয়েছে|

সওয়াল: উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার আযালী কালাম শোনা সম্ভব নয়| আল্লাহ্র কালাম শুনেছি

বলতে, তিলাওয়াতকৃত আওয়াজ বা কালিমা শুনেছি বুঝানো হয়| অথবা তিলাওয়াতকৃত আওয়াজ ও কালাম-ই নাফসী অনুধাবন করেছি বুঝানো হয়| সকল পয়গম্বর এমনকি সকল মানুষ এভাবে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে সক্ষম| তবে কেন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে আলাদাভাবে 'কালীমুল্লাহ' বলা হয়?

জবাব: হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম সাধারণ ইলাহী আদতের থেকে আলাদাভাবে হরফহীন ও আওয়াজহীনভাবে কালাম-ই আযালীকে শুনতে পেয়েছেন| জান্নাতে যেমন আল্লাহ্ তা'আলাকে না বুঝে দেখা যাবে যার ব্যাখ্যা অসম্ভব, তিনি ও তেমনি বর্ণনাতীতভাবে আল্লাহ্‌র কালাম শুনেছেন| অথবা আওয়াজের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র কালাম শুনেছেন, তবে তা শুধুমাত্র কান দিয়ে নয় বরং শরীরের প্রতিটি কণার দ্বারা শুনেছেন| বাতাসের কম্পন কিংবা অন্য কোন মাধ্যমের দ্বারা শুনেন নি| তিনি এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম শুনেছিলেন বিঁধায় তাঁকে '**কালীমুল্লাহ**' বলা হয়েছে| হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রজনীতে সরাসরি কালাম-ই ইলাহী শুনেছেন| একইভাবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামও ওহী নেয়ার সময় শুনেছেন|

৪. ঈমান গ্রহণ আবশ্যক এমন ছয়টি বিষয়ের চতুর্থটি হল: **আল্লাহ প্রেরিত পয়গম্বরদের প্রতি ঈমান আনা**| পয়গম্বরগণ, মহান আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় পথের সন্ধান দেয়ার জন্য, সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন| সমস্ত পয়গম্বরগণ একই ঈমানের কথা বলে গিয়েছেন| 'রুসুল' রাসূলের বহুবচন| এর অর্থ হল প্রেরিত পুরুষ, দূত বা সংবাদদাতা| ইসলাম অনুযায়ী, **রাসূল** হলেন, স্বভাব- প্রকৃতি, শারীরিক গড়ন, ইলম, আকল ইত্যাদির বিবেচনায় সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব| যার কোন মন্দ স্বভাব বা অপছন্দনীয় দিক নেই| সকল পয়গম্বরের '**ইসমত**' সিফাত রয়েছে| অর্থাৎ, নবুয়্যত প্রকাশের পূর্বে বা পরে তাদের দ্বারা ছোট বা বড় কোন ধরণের গুনাহ সম্পাদিত হয় না| (ইসলামকে ভিতর থেকে ধ্বংস করতে ইচ্ছুক কাফিররা বলে যে 'হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়্যত প্রকাশের পূর্বে মূর্তির সামনে কুরবানী দিয়েছেন' আর এর সপক্ষে মাজহাব বিরোধীদের রচিত কিতাব থেকে দলিল প্রদর্শন করে| এই কুৎসিত অপবাদের যে কোন ভিত্তি নাই তা

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়|) নবুয়্যত প্রকাশের পরে তা প্রচারের আগ পর্যন্ত অন্ধ বা বধির হওয়ার মত শারীরিক ত্রুটিও তাদের ছিলনা| এছাড়াও প্রত্যেক পয়গম্বরের সাতটি সিফাত রয়েছে| এগুলিকে বিশ্বাস করা জরুরী| এগুলি নিম্নরূপ: **আমানত**, **সিদক**, **তাবলীগ, আদালত, ইস্‌মত**, **ফাতানাত ও আমনুল আযল্** অর্থাৎ পয়গম্বরগণ কখনোই তাদের নবুয়্যত থেকে বহিষ্কৃত হন না| ফাতানাত অর্থ হল, অত্যন্ত মেধাবী ও খুবই বুঝমান হওয়া|

যে সকল পয়গম্বর নতুন শরীয়ত বা আহকাম নিয়ে এসেছেন তাদেরকে **রাসূল** বলা হয়| নতুন কোন শরীয়ত না এনে পূর্ববর্তী শরীয়তের প্রচারকারী পয়গম্বরদের **নবী** বলা হয়| আল্লাহর আদেশ পৌঁছানো ও মানুষদের তাঁর প্রতি আহবানের ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেয়। পয়গম্বরদের উপর ঈমান আনা বলতে, তাদের পরস্পরের মাঝে কোন ধরণের ভেদাভেদ না করে প্রত্যেককেই মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্বাচিত সাদিক বা সত্যবাদী হিসেবে বিশ্বাস করাকে বুঝায়| কেউ যদি তাঁদের মধ্য থেকে কোন একজনকেও নবী হিসেবে অস্বীকার করে তবে তা সকল পয়গম্বরকেই অস্বীকার করার শামিল হবে|

কঠোর সাধনা করে, অনেক বেশি ইবাদত করে, ক্ষুধার কষ্ট ও অন্যান্য যন্ত্রণা ভোগ করে নব্যুয়ত অর্জন করা সম্ভব নয়| কেবল মাত্র মহান আল্লাহ্ তায়ালা বিশেষ ইহসান বা কৃপার দ্বারা যাকে মনোনীত করবেন তিনিই পয়গম্বর হতে পারেন| মানুষ যেন দুনিয়া ও আখেরাতের কাজ কর্মকে সঠিকভাবে করতে পারে এবং নিজেকে ক্ষতিকর জিনিসের হাত থেকে বাঁচিয়ে সালামত, হেদায়েত ও রহমত অর্জন করতে পারে সেই পথের দিশা দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যুগে যুগে মানুষের নিকট পয়গম্বরদের মাধ্যমে সঠিক দ্বীনের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন| পয়গম্বরগণ, আল্লাহ্ তায়ালা যেসব বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন আর যেসব করতে নিষেধ করেছেন তা প্রচারের ক্ষেত্রে একটুও বিচলিত হননি | দুশমনদের শতবাঁধা, উপহাস, অত্যাচারও তাদেরকে মানুষের কাছে ঈমান ও আমলের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ পালনের দায়িত্ব থেকে পিছপা করতে পারে নি| পয়গম্বরগণ যে তাঁদের দাওয়াতের ব্যাপারে সত্যবাদী ছিলেন তা মানুষের নিকট সত্যায়ন করার

জন্য মুজিযা প্রদান করেছেন| কেউই ঐসব মুজিযার মোকাবিলা করার সামর্থ্য রাখেনি| কোন পয়গম্বরের নবুয়্যত মেনে যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছে তারা ঐ পয়গম্বরের **উম্মত** হিসেবে বিবেচিত হয়| কিয়ামত দিবসে, আল্লাহ্ তায়ালা পয়গম্বরদেরকে স্বীয় গুনাহগার উম্মতের জন্য শাফায়াত করার অনুমতি দিবেন ও তাঁদের শাফায়াত কবুলও করবেন| তাছাড়া উম্মতের আলেম, সালেহ ও অলী বান্দাদেরও শাফায়াতের অনুমতি দেয়া হবে এবং তাদের শাফায়াতও কবুল করা হবে| পয়গম্বরগণ আলাইহিমুস্ সালাওয়াতু ওয়াস্ সালাম তাদের কবরে আমাদের অজানা এক ধরণের হায়াত যাপন করছেন| তাঁদের বরকতময় দেহকে মাটি পঁচাতে পারে না| এ কারণেই একটি হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "**পয়গম্বরগণ নিজেদের কবরে নামাজ আদায় করেন ও হজ্জ পালন করেন**"|

(বর্তমানে আরবে বসবাসরত **ওহাবী** মতবাদের অনুসারীরা এই হাদিসসমূহকে বিশ্বাস করে না| একই সাথে এই হাদিস শরীফকে বিশ্বাসকারী প্রকৃত মুসলমানদেরকে কাফির আখ্যা দেয়| অর্থ স্পষ্ট নয় এমন নাস্সমূহের ভুল ব্যাখ্যা করার কারণে নিজেরা কাফির না হলেও আহলে বিদয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়| মুসলমানদের ইতিক্বাদের ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে| আরবের 'নাজদ্' শহরে জন্ম গ্রহণকারী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহহাব নামক ব্যক্তির দ্বারা ওহহাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠা হয়| ইংরেজ গোয়েন্দা হেম্ফার, ইবনে তাইমিয়াহের[6] ভ্রান্ত ফিকিরসমূহের দ্বারা তাকে প্ররোচিত করে| পরবর্তীতে মিশরের মুহাম্মদ আবদুহ্[7] নামের জনৈক ব্যক্তির রচিত কিতাব সমূহের দ্বারা দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়েছে| এদেরকে পঞ্চম মাজহাব হিসেবে নয় বরং ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী হিসেবে, **আহলে সুন্নাতের** আলেমগণ শত শত কিতাবে অবহিত করেছেন| মহান আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমান যুবকদেরকে ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই ওহহাবী মতবাদের অনুসারী হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখুক এবং হাদিস শরীফের দ্বারা প্রশংসিত **আহলে সুন্নাত** আলেমদের প্রদর্শিত সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না করুক! আমীন!)

---

[6]আহমদইবনেতাইমিয়াহ, ৭২৮হিজরীতথা১৩২৮খৃস্টাব্দেশামনগরেমৃত্যুবরণকরে।

[7]১৩২৩হিজরীতেতথা১৯০৫খৃস্টাব্দেমিশরেমৃত্যুবরণকরে।

পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামদের মুবারক চক্ষু যখন ঘুমায় তখনও তাদের অন্তরচক্ষু ঘুমায় না| পয়গম্বরীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ও পয়গম্বরীয় মর্যাদা ধারণের ক্ষেত্রে সমস্ত পয়গম্বর সমান| উপরে বর্ণিত সাতটি বিষয় প্রত্যেক পয়গম্বরের মাঝে বিদ্যমান| পয়গম্বরগণ কোন অবস্থাতেই স্বীয় দ্বায়িত্ব থেকে বহিষ্কৃত হন না, পদচ্যুত হন না| কিন্তু আওলিয়াদের ক্ষেত্রে অলীত্ব হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে| সমস্ত পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত্ তাসলিমাত মনুষ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত| জ্বিন কিংবা ফেরেশতাদের জাতি থেকে মানুষের জন্য পয়গম্বর হওয়া সম্ভব নয়| কেননা জ্বিন কিংবা ফেরেশতাগণের পক্ষে পয়গম্বরদের সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়| তবে পয়গম্বরদের মাঝে সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে| যেমন উম্মতের আধিক্য, যে এলাকায় পয়গম্বর হিসেবে পাঠানো হয়েছে তার ব্যাপ্তি, ইলম ও মারিফাতের বহু জায়গায় প্রচারিত হওয়া, মুজিযার আধিক্য বা অবিরাম হওয়া, ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ নিয়ামত বা অনুগ্রহ পাওয়া ইত্যাদির বিবেচনায় শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে আখেরী জামানার পয়গম্বর হযরত **মুহাম্মদ** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত পয়গম্বরদের মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন| 'উলুল আজম' পয়গম্বরগণ অন্যদের থেকে এবং যারা রাসূল তাঁরা নবীদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান|

পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাওয়াতু ওয়াস্ সালামদের প্রকৃত সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়| তবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের চেয়ে বেশি হওয়ার ব্যাপারটি মশহুর হয়েছে| তাঁদের মাঝ থেকে তিনশত তের কিংবা তিনশত পনের জন একই সাথে রাসূলও ছিলেন| তাঁদের মাঝ থেকে ছয়জন ছিলেন অধিক মর্যাদাবান| তাঁদেরকে **উলুল্ আযম** পয়গম্বর বলা হয়| তাঁরা হলেন, **হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা** আলাইহিমুস্ সালাম **ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম|

পয়গম্বরদের মাঝ থেকে তেত্রিশ জনের নাম মশহুর হয়েছে| তাঁরা হলেন: **হযরত আদম, হযরত ইদ্রিস, হযরত শিত বা শীষ, হযরত নূহ, হযরত হুদ, হযরত সালিহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত লূত, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত**

ইউসুফ, হযরত আইয়ুব, হযরত শুয়াইব, হযরত মূসা, হযরত হারুন, হযরত খিজির, হযরত ইউসা বিন নূন, হযরত ইলিয়াস, হযরত আলইয়াসা, হযরত যুল-কিফিল, হযরত শামুন, হযরত ইসমাইল, হযরত ইউনুস বিন মাত্তা, হযরত দাউদ, হযরত সুলায়মান, হযরত লোকমান, হযরত যাকারিয়্যা, হযরত ইয়াহিয়া, হযরত উযাইর, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম, হযরত যুল-কারনাইন আলাইহিমুস্ সালাম **ও হযরত মুহাম্মদ** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম|

উপরোক্ত পয়গম্বরদের মধ্য থেকে আটাশজনের নাম কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে| শীষ, খিজির, ইউসা, শামুন ও ইশমাইল আলাইহিমুস সালামের নাম উল্লেখ নেই। হযরত যুল-কারনাইন, হযরত লোকমান ও হযরত উযাইর আলাইহিমুস্ সালাম পয়গম্বর ছিলেন কিনা, এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে| উরওয়াতুল উসকা হযরত **মোহাম্মদ মাসুম** কুদ্দিসা সিররুহু'এর **মাকতুবাত-ই মাসুমিয়্যা**'র দ্বিতীয় খণ্ডের ছত্রিশতম মাকতুবে, হযরত খিজির আলাইহিস্ সালামের পয়গম্বর হওয়ার ব্যাপারে শক্তিশালী খবর রয়েছে বলে উল্লেখ আছে| একশ বিরাশিতম মাকতুবে, হযরত খিজির আলাইহিস্ সালামের মানুষরূপে দৃশ্যমান হওয়া ও কিছু কিছু কাজ কর্ম সম্পাদন করা প্রমাণ করে না যে তিনি এখনো দুনিয়ার হায়াত ধারণকারী| তিনি এবং তাঁর মত একাধিক পয়গম্বর ও আওলিয়াদের রূহসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের রূপ ধারণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে| তাই তাঁদের দৃশ্যমান হওয়া তাঁদের দুনিয়াবী হায়াতের বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে দলিল হবে না| জুলকিফিল্ আলাইহিস্ সালামের অপর নাম হারকিল| তাঁকে কেউ ইলিয়াস, কেউই ইদরিস্ কেউ বা যাকারিয়্যা আলাইহিস্ সালাম বলেও অভিহিত করেছেন|

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম হলেন 'খলীলুল্লাহ'| কেননা তাঁর ক্বাল্বে আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা ব্যতীত কোন মাখলুকের ভালোবাসা ছিল না| হযরত মূসা আলাইহিস্ সাল্লাম হলেন 'কলীমুল্লাহ' | কেননা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলেছিলেন| হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম হলেন 'কালিমাতুল্লাহ'| কারণ তাঁর বাবা ছিল না| শুধুমাত্র 'কুন্' (হও) এই ইলাহী কালিমার দ্বারা মায়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে

এসেছিলেন| তাছাড়াও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হিকমতপূর্ণ কালিমাসমূহকে ওয়াজ করে মানুষের কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন|

বনী আদমের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী এবং সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টির কারণ হযরত **মুহাম্মদ** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'হাবীবুল্লাহ'| তাঁর হাবীবুল্লাহ হওয়ার প্রমাণকারী এবং তাঁর গুরুত্ব, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি নির্দেশকারী বহু দলীল রয়েছে| তাই তাঁর ব্যাপারে পরাজিত হয়েছে, পর্যুদস্ত হয়েছে এরূপ ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়| কিয়ামত দিবসে তিনিই সর্ব প্রথম কবর থেকে জাগ্রত হবেন| হাশরের ময়দানেও সবার আগে উপস্থিত হবেন| আর জান্নাতেও সর্বপ্রথম তিনি প্রবেশ করবেন| তাঁর মুজিযাসমূহ অগণিত, মানুষের পক্ষে তা গুণে শেষ করা সম্ভব নয়| তথাপি **'মিরাজ'** মুজিযার বিষয়টি উল্লেখ করতঃ এই লেখাটিকে সাঁজানোর চেষ্টা করছি|

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শায়িত অবস্থা থেকে জাগিয়ে, তাঁর মুবারক শরীরসহ তাঁকে পবিত্র মক্কা নগরী থেকে কুদুস্ শহরে অবস্থিত মসজিদে আকসায়, সেখান থেকে আসমানসমূহ পার করে সর্বশেষ সপ্তম আসমানে এবং সেখান থেকে আল্লাহ্ তায়ালা যেসব স্থানে চেয়েছেন সেসব স্থানে ভ্রমণ করানো হয়েছে| এভাবেই মিরাজের বিষয়টি বিশ্বাস করা উচিত| ('ইসমাঈলী' নামক ভ্রান্ত ফিরকার অনুসারীরাও ইসলামের আলেমরূপ ধারণকারী দ্বীনের দুশমনেরা প্রচার করে যে, মিরাজ একটি অবস্থার নাম যা রূহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে ছিল| রাসূল স্বশরীরে মিরাজে যাননি, তারা এই বলে যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে| এই ধরণের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচারকারী বইসমূহ পড়া ও এর দ্বারা প্ররোচিত হওয়া উচিত নয়| মিরাজ কিভাবে সংঘটিত হয়েছে তা বহু মূল্যবান কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমন **শিফা-ই শরীফে**[৪]বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, **সা'আদাত-ই আবাদিয়্যা** কিতাবেও এর দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে|) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা-ই মুকাররমা থেকে **সিদরাতুল মুনতাহা** পর্যন্ত হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের সাথে ভ্রমণ করেছেন| **সিদরাতুল মুনতাহা** হল ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে অবস্থিত একটি বৃক্ষের নাম, সমস্ত তথ্য ও

[৪]'শিফা' এর রচয়িতা কাজী ইয়াদ মালিকী, ৫৪৪ হিজরী (১১৫০ খৃস্টাব্দে) মাররাকুস নগরীতে ইনতিকাল করেন।

উত্থানসমূহ যাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না| রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহাতে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে ছয়শত ডানাসহ তাঁর আপন রূপে দেখেছেন| এই পর্যন্ত এসে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম থেমে যান| মক্কা-ই মুকাররমা থেকে কুদুস শরীফ পর্যন্ত কিংবা সপ্তম আসমান পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'বুরাক' এর দ্বারা নিয়ে যাওয়া হয়েছে| **বুরাক** হল গাধার চেয়ে বড় কিন্তু ঘোড়ার চেয়ে ছোট অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন জান্নাতি এক পশু| তা দুনিয়ার পশুদের অন্তর্ভূক্ত নয়| তা পুরুষও নয় স্ত্রীও নয়| এক পলকে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করতে পারে| রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আকসায় পয়গম্বরদের জামাতের ইমাম হয়ে এশার কিংবা ফজরের নামাজ আদায় করেছেন| পয়গম্বর আলাইহিস্ সালামদের রূহসমূহ নিজ নিজ ইনসানী রূপ ধারণ করে ঐ জামাতে উপস্থিত ছিল| **কুদুস** থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত **মিরাজ** নামক অজানা এক সিঁড়ির মাধ্যমে মুহুর্তের মধ্যে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল| পথে ফেরেশতাগণ ডানে বামে সারিবদ্ধ হয়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুরুদ ও ছানা পেশ করছিল| প্রত্যেক আসমান অতিক্রম করার সময় জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তশরীফ ফরমানের ঘোষণা ও সুসংবাদ প্রদান করতেন| রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক আসমানে এক একজন পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম বিনিময় করেছেন| **সিদরাতুল মুনতাহা**য় বহু আশ্চর্যজনক জিনিস দেখতে পেয়েছেন| জান্নাতের নিয়ামতসমূহ ও জাহান্নামের আজাবসমূহ অবলোকন করেছেন| মহান আল্লাহ্ পাকের জামাল তথা সৌন্দর্য দর্শনের তীব্র আকাঙ্খার কারণে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের কোনটির প্রতি দৃষ্টি দেননি| সেখান থেকে তিনি একাকী নূরের মধ্য দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন| এসময় ফেরেশতাদের কলমের আওয়াজ শ্রবণ করেছেন| তিনি এভাবে সত্তর হাজার পর্দা অতিক্রম করেছেন, যার দুইটি পর্দার মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচ হাজার বছরের পথের সমান| এরপর সূর্যের চেয়েও অধিকতর উজ্জ্বল **রফ্‌রফ্** নামক মাদুরে চড়ে ইলাহী আরশে পৌঁছেছেন| আরশ থেকে জামান, মাকান

ও বস্তুজগতের উর্দ্ধে গিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কালাম শ্রবণের মাকামে উপনীত হয়েছেন|

স্থানহীন ও কালহীনভাবে আখিরাতে যেমন মহান আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভ করা যাবে, তেমনি অবোধ্য ও অবর্ননীয় উপায়ে তিনি আল্লাহ্ পাকের দিদার লাভ করেছেন| বর্ণহীন ও আওয়াজহীন উপায়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলেছেন| মহান আল্লাহ্র দরবারে তাসবীহ, হামদ ও ছানা পেশ করেছেন| নিজে অগণিত নিয়ামত, অনুগ্রহ এবং সীমাহীন মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন| সেখানেই নিজের ও উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের আদেশ প্রাপ্ত হন, যা পরবর্তীতে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের পরামর্শে ধাপে ধাপে ফিরে পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত কমিয়ে এনেছেন| ইতিপূর্বে কেবল ফজর ও আছর কিংবা এশার নামাজ আদায় করা হত| এত সুদীর্ঘ ভ্রমণ ও সীমাহীন ইকরাম, ইহসান প্রাপ্তির পরে এবং আশ্চর্যজনক বহু কিছু দেখে ও শুনে ফিরার পরে যখন তিনি নিজ বিছানায় আসলেন, দেখলেন যে বিছানা তখনও উষ্ণ রয়েছে| মিরাজ সম্পর্কিত ঘটনার কিছু অংশ আয়াত-ই করীমার দ্বারা আর বাকী অংশ হাদিস শরীফের দ্বারা জানানো হয়েছে| এর সব অংশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব না হলেও, আহলে সুন্নাত আলেমদের থেকে আসা এ সংক্রান্ত খবরসমূহকে গ্রহণ না করলে, আহলে সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হতে হবে| আর সরাসরি আয়াত-ই করীমা ও সহীহ হাদিস শরীফকে অবিশ্বাস করলে কুফুরী হবে|

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন **সাইয়্যেদুল আম্বিয়া**, অর্থাৎ সমস্ত পয়গম্বরগণের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ জন, এর পক্ষে অসংখ্য দলিল রয়েছে, যার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো|

কিয়ামতের দিবসে সমস্ত পয়গম্বরগণ তাঁর আরশের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সমস্ত পয়গম্বরগণকে এই বলে আদেশ দিয়েছেন যে, "সর্বাধিক প্রিয় আমার হাবীব মুহাম্মদ আলাইহিস্ সালামের নবুয়্যতের যুগে যদি উপস্থিত হও, তবে তাঁর উপর ঈমান আনো এবং তাঁর সাহায্যকারী হয়ে যাও"| সমস্ত পয়গম্বরগণও নিজ নিজ উম্মতকে তা অসিয়্যত করে গেছেন|

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন **খাতামুল আম্বিয়া**| অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোন পয়গম্বর আসবেন না| তাঁর

মুবারক রূহকে সকল পয়গম্বরের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে| নবুয়্যতের মাকামেও তাঁকেই সর্বপ্রথম স্থান দেয়া হয়েছে| আর তাঁর দুনিয়ায় আগমনের মাধ্যমে নবুয়্যতের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়েছে| হযরত ঈসা আলাইহিমুস্ সালাম কিয়ামতের আগে হযরত মেহদী'র জামানায় আসমান থেকে শাম (সিরিয়ায়) অবতরণ করবেন এবং তিনি জমিনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনকেই প্রচার করবেন এবং তাঁর উম্মতেরই একজন হিসেবে বিবেচিত হবেন|

১২৯৬ হিজরীতে /১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুস্তানে ইংরেজরা **কাদিয়ানী বা আহমদী** নামক এক বাতিল ফিরকার উদ্ভব করে| তারা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কেও মিথ্যা, কুৎসিত ধারণা পোষণ করে| তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে মূলত ভিতর থেকে ইসলামের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা চালায়| তারা যে অমুসলিম, এ ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে|

হিন্দুস্তানে প্রকাশ পাওয়া আহলে বিদায়াত ও জিনদিক ফিরকাসমূহের আরেকটি হল **জামায়াতুত তাবলিগীয়্যা** | যা ১৩৪৫ হিজরীতে (১৯২৬ খৃস্টাব্দে) ইলিয়াস নামের এক জাহিল প্রতিষ্ঠা করেছে| তার বক্তব্য ছিল, 'মুসলমানরা গোমরাহিতে পতিত হয়েছে, তাদেরকে রক্ষার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হয়েছি' | সে তার গুরু ভ্রষ্ট নাজির হুসাইন, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি ও খালিল আহম্মদ শাহরানপুরীর কিতাবসমূহ থেকে যা শিখেছে,তা প্রচার করতো| মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার জন্য তারা সর্বদা নামাজ ও জামাতের গুরুত্বের ব্যাপারে আলোচনা করে| অথচ, আহলে বিদায়াতের অর্থাৎ **আহলে সুন্নাতের** মাজহাবের অনুসারী নয় এমন কারো নামাজসমূহ ও অন্যান্য ইবাদতের কিছুই কবুল হয় না| তাই তাদের উচিত, আহলে সুন্নাতের কিতাবসমূহ পড়ে প্রথমে বিদায়াতী আক্বীদা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত মুসলমান হওয়া| কুরআন করীমে, স্পষ্ট নয় এমন আয়াতে করীমার ভুল অর্থ প্রদানকারীদের **আহলে বিদায়াত** বা **ভ্রষ্ট** বলা হয়| নিজের ভ্রান্ত মতবাদ ও অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের উদ্দেশ্যে আয়াতে করীমার ভুলব্যাখ্যা প্রদানকারী ইসলামের দুশমনদেরকে **জিনদিক** বলা হয়| জিনদিকরা পবিত্র কুরআন করীম ও ইসলামকে পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা চালিয়া যাচ্ছে| এদেরকে লালন পালনকারী ও দুনিয়ার সর্বত্র প্রচারের জন্য

কোটি কোটি টাকা খরচ প্রদানকারী, সবচেয়ে বড় দুশমন হল ইংরেজ| এই ইংরেজ কাফিরদের ফাঁদে পা দেয়া জাহিল ফিরকা হল **জামায়াতুত- তাবলীগিয়্যা** যারা নিজেদেরকে **আহলে সুন্নাত** দাবী করে নামাজ আদায় করে মিথ্যা বলছে, মুসলমানদেরকে প্রতারিত করছে| হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "দ্বীন বিশ্বাস করেনা এমন নামাজ আদায়কারীদের দেখা মিলবে"| এরা জাহান্নামের নিম্নস্থলে চিরকাল আযাব ভোগ করবে| তাদের এক অংশ, মিনারের চূড়ায় থাকা বকের বাসার মত বড় পাগড়ী, দাড়ি ও জুব্বাসহ আয়াতে করীমা পড়ে, এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করে| অথচ হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "**ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়া সিয়াবিকুম ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া নিয়্যাতিকুম**", (আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক রূপ ও পোশাক দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের ক্বলব ও নিয়্যাতের প্রতি লক্ষ্য করেন)| পঙক্তি:

কাদ্দ-ই বুলন্দ দারদ, দাস্তার পারা পারা,
চুন আশিয়ান-ই লকলক, বার কাল্লা- ই মিনারা |

এই জাহিলদের, আহমকদের আকর্ষনীয় বক্তব্যগুলি যে মিথ্যা, তা প্রমাণকারী **হাক্বীকাত কিতাবেভী** এর কিতাবসমূহের জবাব দিতে অপারগ হওয়ায় এই বলে প্রচার করে যে, 'হাক্বীকাত কিতাবেভীর কিতাবসমূহ ভুল, ভ্রান্তিতে পূর্ণ| এই কিতাবসমূহ পড়া থেকে বিরত থাকুন'| ইসলামের দুশমন ভণ্ড ও জিনদিকদের সবচেয়ে বড় আলামত হল, আহলে সুন্নাত আলেমদের দ্বারা লিখিত ও প্রকাশিত হাকিকী দ্বীন কিতাবসমূহকে ভুল আখ্যা দেয়া, তা পড়তে বারণ করা| তাদের দ্বারা ইসলামের যে ক্ষতি হয়েছে ও তাদের বিপক্ষে আহলে সুন্নাত আলেমদের প্রদত্ত জবাবসমূহ **মা'লুমাতুন- নাফিয়া** নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে|)

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ও সমস্ত জগতের জন্য রহমত| আঠার হাজার আলম তথা জগত তাঁর রহমতের দরিয়া থেকে উপকৃত হচ্ছে| অনস্বীকার্যভাবে তিনি সমস্ত মানব ও জ্বিনের জন্য পয়গম্বর| এমনকি ফেরেশতাগণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলসহ সকল জড়ের জন্যও তিনি পয়গম্বর| এব্যাপারে বহু

মুবারক ব্যক্তি খবর প্রদান করেছেন| অন্যান্য পয়গম্বরগণ নির্দিষ্ট কোন এলাকায়, নির্দিষ্ট কোন জাতি কিংবা গোত্রের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন| আর রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সমস্ত জগতের জন্য, জড় ও জীব সমস্ত মাখলুকের জন্য পয়গম্বর| মহান আল্লাহ্ তায়ালা অন্যান্য পয়গম্বরদের ক্ষেত্রে সরাসরি নাম ধরে সম্বোধন করেছেন| কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, ওহে আমার রাসূল! ওহে আমার পয়গম্বর! বলে সম্বোধন করে মর্যাদা প্রদান করেছেন, সম্মানিত করেছেন| অন্যান্য পয়গম্বর আলাইহিস্ সালামদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে দেয়া সকল মুজিযার অনুরূপ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও ইহসান করা হয়েছে| আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এত বেশি সম্মান দিয়েছেন, এত বেশি ইকরাম করেছেন, এত বেশি মুজিযা প্রদান করেছেন যে, অন্য কোন পয়গম্বরকে অনুরূপ প্রদান করেননি| হযরত পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, মুবারক হাতের তালুতে নেয়া পাথরগুলির তাসবীহ্ পাঠ করা, বৃক্ষরাজির 'ইয়া রাসূলুল্লাহ!' বলে তাঁকে সালাম প্রদান করা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচ্ছেদের কারণে **হান্নানা** নামক শুঁকনো কাঠের শব্দ করে ক্রন্দন করা, রাসূলের মুবারক আঙ্গুলগুলি থেকে সুপেয় পানির প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদির মত মুজিযার দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে| আখিরাতে তাঁকে **মাকাম-ই মাহমুদ**, **শাফায়াত-ই কুবরা, হাউজ- এ কাওসার**, **উসিলা** ও **ফাদিলা** নামক মাকামসমূহ প্রদান করে এবং জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই জামাল-ই ইলাহী এর দর্শনের দ্বারা মহিমান্বিত করা হয়েছে| আর দুনিয়াতে সর্বোত্তম চরিত্র, অকাট্য দ্বীন, ইলম, হিলম্, সবর, শুকরিয়া, তাকওয়া, সম্মান, মর্যাদা, লাজুকতা, সাহসিকতা, বিনয়, হিকমত, আদব, সৎকর্মশীলতা, দয়া, করুণা, মমতা ও আরো বহুধরণের বিশেষণে বিশেষিত করে সকল পয়গম্বরের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন| তাঁকে অগণিত মুজিযা প্রদান করা হয়েছে| তাঁর আনীত দ্বীন পূর্বের যাবতীয় দ্বীনকে রহিত করেছে, যা পরিপূর্ণ, সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ| তাঁর উম্মত অন্যান্য সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ| তাঁর উম্মতের আওলিয়াগণ অন্যান্য উম্মতের আওলিয়াদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান|

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের আওলিয়াদের মাঝে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা হওয়ার যোগ্যতা অর্জনকারী, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) খেলাফতের ব্যাপারে সর্বাধিক উপযুক্ত, ইমাম ও ওলীদের মাথার তাজ হলেন হযরত **আবু বকর সিদ্দীক** রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি পয়গম্বরদের পরে এ পর্যন্ত যত মানুষ এই দুনিয়ায় এসেছেন এবং আসবেন তাদের মাঝে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জন| খিলাফতের মর্যাদা ও দায়িত্বভারও তাই তিনিই সর্বপ্রথম অর্জন করেন| ইসলাম প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেও তিনি মহান আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও ইহসানের কারণে মূর্তিপূজা করেন নি| কুফুরী ও ভ্রষ্টতার পঙ্কিলতা থেকে মহান আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন| (আর যারা মনে করে ও প্রচার করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যতের পূর্বে মূর্তি পূজা করে ছিলেন, তারা কতটা মূর্খ এ থেকেও তা বুঝা যায়|)

তাঁরপরের শ্রেষ্ঠ মানব হলেন ফারুক-ই আযম হযরত **উমর ইবনে খাত্তাব** রাদিয়াল্লাহু আনহু, যাকে আল্লাহ্ তায়ালা আপন হাবীবের সঙ্গী হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং যিনি দ্বিতীয় খলীফা হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেছেন|

উনার পরের শ্রেষ্ঠজন হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৃতীয় খলীফা, পুণ্য ও ইহসানের ভাণ্ডার এবং ঈমান, হায়া ও ইরফানের উৎস, যিন্নুরাইন হযরত **উসমান ইবনে আফফান** রাদিয়াল্লাহু আনহু|

তাঁর পর সর্বোত্তম মানুষ হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চতুর্থ খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী, যিনি আশ্চর্যজনক প্রতিভার অধিকারী ও আল্লাহ্‌র সিংহ উপাধি অর্জনকারী, হযরত **আলী ইবনে আবি তালিব** রাদিয়াল্লাহু আনহু|

উনার পরে হযরত **হাসান ইবনে আলী** রাদিয়াল্লাহু আনহুমা খলিফা হয়েছেন| হাদিস শরীফে খেলাফতের সীমা ত্রিশ বছর উল্লেখ করা হয়েছে, যা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে[৭]| তাঁর পরে শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৭]হাসান ইবনে আলী ৪ ৯হিজরীতে (৬৬৯ খৃস্টাব্দে) মদিনা-ই মুনাওয়ারাতে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেছেন।

ওয়া সাল্লামের চোখের মনি হযরত **হুসাইন ইবনে আলী** রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা|

তাঁদের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল অধিক সওয়াব অর্জন করা, দ্বীন-ই ইসলামের জন্য মাতৃভূমি, প্রিয়জন ইত্যাদি ত্যাগ করতে পারা, শুরুর দিকে মুসলমান হওয়া, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বোচ্চ অনুসরণ করা, তাঁর সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, দ্বীন প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, ফিতনা-ফাসাদ্ ও কুফুরীর প্রতিরোধ করা|

যদিও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত অন্য সবার আগে মুসলমান হয়েছেন কিন্তু তিনি ঐ সময় মাল-সম্পদহীন বালক হওয়ায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে রাসূলের খেদমতে নিয়োজিত থাকায়, শুরুতেই তাঁর ঈমান গ্রহণ অন্যদের ঈমান গ্রহণে উদ্ভুদ্ধ করার ও কাফিরদের মনোবল ধ্বংসের কারণ হতে পারেননি| অথচ অন্য তিন খলিফার ঈমান গ্রহণ, ইসলামের শক্তিকে বৃদ্ধি করেছিল| ইমাম আলী ও তাঁর সন্তানগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয় হওয়ায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক রক্ত ধারণ করায়, সিদ্দীক-ই আকবর ও ফারুক-ই আজমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে| তবে তাঁদের এই শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব বিবেচনায় নয়| এই শ্রেষ্ঠত্ব সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়| এটা খিজির আলাইহিস্ সালাম যেমন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে কিছু বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার অনুরূপ| (রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে যিনি তাঁর যত নিকটের, তিনি ততই শ্রেষ্ঠ হলে হযরত আব্বাস, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শ্রেষ্ঠ হতেন| এ কারণেই আবু তালেব ও আবু লাহাব, মুমিনদের সর্ব নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তির চেয়েও বহু গুণে অধম|) রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে হযরত **ফাতেমা**, হযরত **খাদিজা** ও হযরত **আয়েশা** রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না থেকে অধিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার| তবে এই বিবেচনার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব বিবেচনার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করে না| এই তিনজন মহীয়সী নারীর মাঝে কে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ সে ব্যাপারে আলেমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন| হাদিস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে দুনিয়ার নারীদের মাঝে সর্বোত্তম হলেন হযরত ফাতিমা, হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না এবং

হযরত মরিয়ম ও ফারাও এর স্ত্রী হযরত আছিয়া আলাইহুমাস্ সালাম| হাদিস শরীফে এসেছে, **হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) জান্নাতী মহিলাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ আর হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা) হলেন জান্নাতী যুবকদের মাঝে শ্রেষ্ঠ**| এই হাদিসটি শুধুমাত্র একটি দিক বিবেচনায় শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত করে।

উনাদের পরে, আসহাবে কিরামের মাঝে অধিক মর্যাদাবান হলেন **আশারা-ই মুবাশশারা** এর অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণ| এর মানে হল, যারা দুনিয়াতে থাকা অবস্থাতেই জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ পেয়েছিলেন | তাঁদের সংখ্যা দশ | উনাদের পরে অধিক মর্যাদার অধিকারী হলেন বদরের জিহাদে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবী| এরপর পর্যায়ক্রমে উহুদের জিহাদে অংশগ্রহণকারী ৭০০জন। তাদের পর ১৪০০ মুসলিম, যারা **বায়্যাতুর রিদওয়ান** এ (হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়) উপস্থিত ছিলেন সেসকল সাহাবী অধিক মর্যাদাবান|

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নিজেদের জান ও মাল উৎসর্গ করেছেন, তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন যে আসহাবে কিরাম, তাঁদের প্রত্যেককে যথাযথ সম্মান ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য| তাঁদের অসম্মান হয় এমন কোন কথা বা আচরণ করা আমাদের জন্য কখনোই জায়েজ হবে না| তাঁদের নামসমূহকে অমর্যাদা করা, তাচ্ছিল্য করা পথভ্রষ্টতার শামিল|

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসেন, তাদের উপর রাসূলের প্রত্যেক সাহাবীকে ভালোবাসাও আবশ্যক| কেননা একটি হাদিস শরীফে এসেছে যে, "**আমার সাহাবীদের যারা ভালোবাসলো তারা আমাকে ভালোবাসে বলেই এরূপ করলো| যারা তাঁদেরকে ভালোবাসলো না, তারা আমাকেও ভালোবাসলো না| তাঁদের কাউকে কষ্ট দেয়া আমাকে কষ্ট দেয়ার শামিল| আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে মূলত আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্ট দিল| আল্লাহ্ তা'আলাকে যে কষ্ট দিল সে অবশ্যই আজাব ভোগ করবে**" |অপর আরেকটি হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "**মহান আল্লাহ্ তায়ালা যখন আমার উম্মত থেকে কারো জন্য কল্যাণ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তার অন্তরে আমার সাহাবীদের প্রতি**

ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন| সে প্রত্যেক সাহাবীকে নিজের প্রাণের মত ভালোবাসে"|

একারণেই, আসহাবে কিরামদের মাঝে যে সংঘর্ষ হয়েছে; তা অসৎ উদ্দেশ্যে বা খেলাফত দখলের উদ্দেশ্যে কিংবা নাফসের বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হয়েছে বলে মনে করা উচিত নয়| এরূপ ভাবা এবং এ কারণে তাঁদেরকে কটাক্ষ করা মুনাফেকীর পরিচায়ক, যা ব্যক্তিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়| কেননা তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালামের সরাসরি সান্নিধ্য লাভের ও তাঁর মুবারক কথা শ্রবণ করার কারণে, জেদ ও অসহনসীলতা এবং পদের লোভ ও দুনিয়ার আসক্তি তাঁদের প্রত্যেকের অন্তর থেকে মুছে গিয়েছিল| অতৃপ্তি, আসক্তি, হিংসা ও মন্দ আচরণ থেকে তাঁরা মুক্ত ছিল, পবিত্র ছিল| ঐ মহান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের আওলিয়ার থেকে কোন একজনের সান্নিধ্যে কয়েকদিন অতিবাহিত করার কারণে যদি কোন ব্যক্তি, ঐ ওলীর সুন্দর বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উন্নত আখলাকের দ্বারা উপকৃত হয়, আত্মশুদ্ধি লাভ করে ও দুনিয়ার আসক্তি থেকে মুক্তি পায় তবে আসহাবে কিরামগণ, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব কিছুর চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন, রাসূলের জন্য নিজের জান, মাল উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিলেন তাঁরা, রূহের ক্ষুধা মিটায় রাসূলের এমন সোহবতের আশিক হওয়া সত্ত্বেও, মন্দ স্বভাব থেকে পরিত্রাণ পায়নি, নাফসসমূহকে সংশোধন করতে পারেনি, ক্ষণিকের এই দুনিয়া উপভোগের জন্য পরস্পর লড়াই করেছে, তা কিভাবে চিন্তা করা সম্ভব? ঐ মহান ব্যক্তিগণের মন, অবশ্যই অন্য সকলের চেয়ে অধিক পরিষ্কার ছিল| তাঁদের মাঝের মতানৈক্য ও দ্বন্দকে, আমাদের মত নষ্ট নিয়্যাতের অধিকারীদের সাথে তুলনা দেয়া, দুনিয়ার জন্য ও নাফসের কুবাসনা চরিতার্থের জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে বলে দাবী করা কি সংগতিপূর্ণ হবে? আসহাব-ই কিরামদের ব্যাপারে এরূপ কুৎসিত ধারণা পোষণ করা জায়েজ নয়| যারা এরূপ বলে, তারা কি কখনো এটি খেয়াল করে না যে, আসহাব-ই কিরামের সাথে দুশমনি করা প্রকারন্তরে তাঁদের দীক্ষা দানকারী ও পরিচর্যাকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দুশমনি করার শামিল হয়| তাঁদের নিন্দা করা প্রকারন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের নিন্দার সমতুল্য| এ কারণেই বুজুর্গ দ্বীন আলেমগণ বলেছেন যে, 'যারা আসহাব-ই কিরামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানে না, তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে না, তারা মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিই ঈমান আনল না'| উষ্ট্রী ও সিফফিনের যুদ্ধ, কোনো ভাবেই তাঁদের সমালোচনার কোন কারণ হতে পারে না| এই যুদ্ধগুলিতে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছেন তাঁদের সকলকে সমালোচনা থেকে পরিত্রাণের জন্য, এমনকি সওয়াব অর্জনের মাধ্যম হওয়ার মত দ্বীনী কারণ বিদ্যমান রয়েছে| হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, **"ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মুজতাহিদের জন্য একটি সওয়াব আর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য দুইটি অথবা দশটি সওয়াব রয়েছে| দুইটি সওয়াবের প্রথমটি ইজতিহাদের জন্য আর দ্বিতীয়টি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য"**| দ্বীনের বুজুর্গ ব্যক্তিদের মাঝের এই দ্বন্দ ও সংঘাত, জেদের কারণে বা শত্রুতার কারণে নয়; বরং ইজতিহাদের ভিন্নতার কারণে হয়েছিল| ইসলামের আদেশসমূহকে যথাযথভাবে প্রয়োগের ইচ্ছার কারণে হয়েছিল| আসহাব-ই কিরামের প্রত্যেকেই মুজতাহিদ ছিলেন| (উদাহরণ স্বরূপ, হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মুজতাহিদ হওয়ার ব্যাপারে, 'হাদিকা 'কিতাবের দুইশত আটানব্বইতম পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হাদিস শরীফ দ্বারা অবহিত করা হয়েছে|)

প্রত্যেক মুজতাহিদের জন্য আপন ইজতিহাদ অনুযায়ী যে হুকুম বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তদনুযায়ী আমল করা ফরজ| নিজের ইজতিহাদ যদিও বা নিজের চেয়ে বড় কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদের অনুরূপ নাও হয়, তবুও তার উপর নিজের ইজতিহাদের উপর আমল করা আবশ্যক| অন্য কারো ইজতিহাদের অনুসরণ করা তার জন্য নয়| ইমাম আজম হযরত আবু হানিফার[10] দুইজন ছাত্র হযরত আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ শায়বানী এবং ইমাম মুহাম্মদ শাফিঈ[11]এর দুইজন ছাত্র আবু সাওর ও ইসমাঈল মুজানী বহু ক্ষেত্রে আপন উস্তাদদের অনুসরণ করেননি| তারা উস্তাদদের **হারাম** হিসেবে বিবেচিত করা কিছু

[10]আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত, ১৫০ হিজরীতে (৭৬৭ খৃস্টাব্দে) বাগদাদে ইনতিকাল করেন।
[11]মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফিঈ, ২০৪ হিজরীতে (৮২০ খৃস্টাব্দে) মিসরে ইনতিকাল করেছেন।

জিনিসকে **হালাল** হিসেবে হুকুম দিয়েছেন| আবার হালাল হিসেবে বিবেচিত কিছু জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছেন| এর উপর ভিত্তি করে, তাঁরা গুনাহের কাজ করেছেন, পাপী হয়েছেন বলা সঠিক নয়| ইতিহাসে এরূপ বক্তব্য প্রদানকারী কারো হদিস পাওয়া যায়নি| কেননা, তাঁরাও তাঁদের উস্তাদদের মত মুজতাহিদ ছিলেন|

বস্তুত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার থেকে অধিক জ্ঞানী ও অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন| উনাদের তুলনায় নিজের মাঝে বহু শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলী বিদ্যমান ছিল| তাঁর ইজতিহাদও ঐ দুইজনের ইজতিহাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য ছিল| তথাপি প্রত্যেক সাহাবীই মুজতাহিদ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায়, দুইজনেরই এই মহান ইমামের ইজতিহাদকে অনুসরণ করা জায়েজ হত না| তাঁদের উপর আপন ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক ছিল|

সওয়াল: জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে, মুহাজির ও আনসারের মাঝ থেকে বহু সাহাবী ইমাম আলীর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, তাঁর আনুগত্য করেছিল, তাঁর অনুসরণ করেছিল| তাঁদের প্রত্যেকেই মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও, ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসরণকে আবশ্যক মনে করেছিল| এর থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম আলীর আনুগত্য করা মুজতাহিদদের উপরও ওয়াজিব ছিল| আপন ইজতিহাদ না মিললেও তাঁর পক্ষে অবস্থান নেয়া তাদের জন্য আবশ্যক ছিল কি?

জবাব: হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে যারা অনুসরণ করেছিল, তাঁর পক্ষে যারা যুদ্ধ করেছিল, তাঁরা তাঁর ইজতিহাদের উপর আমল করার জন্য তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেননি| বরং নিজেদের ইজতিহাদ ও ইমামের ইজতিহাদের অনুরূপ হওয়ায়, তাঁদের ইজতিহাদই ইমাম আলীর আনুগত্যকে ওয়াজিব বিবেচনা করেছে| একইভাবে, মহান আসহাবে কিরামের অনেকের ইজতিহাদ, ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইজতিহাদের সাথে মিলেনি| তাঁদের ইজতিহাদ অনুযায়ী, এই মহান ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করা আবশ্যক ছিল| ঐ সময়ে আসহাব-ই কিরামের ইজতিহাদের হুকুম তিন ধরণের ছিল| একদল, ইমাম আলীর ইজতিহাদকে হক্ব হিসেবে বুঝতে পেরেছিল| তাঁদের উপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর

আনুগত্য করা ওয়াজিব ছিল| আরেক দল, তাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের ইজতিহাদকে হক্ব হিসেবে দেখতে পেয়েছিল| তাঁদের উপর হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়েছিল| আর তৃতীয় দলের ইজতিহাদ ছিল, কোন পক্ষেরই অনুসরণ না করা, পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া আবশ্যক| তাঁদের এই ইজতিহাদ, যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়াকে ওয়াজিব করেছিল| তিন দলই হক্বের উপর ছিল ও পরকালে সওয়াব অর্জনের উপযুক্ত|

সওয়াল: উপরের বক্তব্য অনুযায়ী, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছেন তাদের ইজতিহাদকেও হক্ব হিসেবে বিবেচনা করছে| অথচ, আহলে সুন্নাত আলেমদের মতে, ইমাম আলীর ইজতিহাদ হক্ব ছিল, তাঁর বিরোধীদের ইজতিহাদে ভুল ছিল, যেহেতু শরয়ী উজর ছিল তাই তাঁরা ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছেন, আর এজন্য সওয়াবও অর্জন করেছেন| এর ব্যাখ্যা কি?

জবাব: ইমাম শাফিঈ ও হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলার মত দ্বীনের বুজুর্গ ব্যক্তিগণ জানিয়েছেন, আসহাব-ই কিরামের কোন পক্ষের জন্যই ভুল করেছেন বলা জায়েজ নয়| এ কারণেই, 'বুজুর্গ ব্যক্তিদের জন্য ভুল করেছে' বলাটা সমীচীন নয়| ছোটদের জন্য বড়দের ব্যাপারে, 'সঠিক করেছে, ভুল করেছে, পছন্দ করেছি, পছন্দ হয়নি 'ইত্যাদির মত বলা জায়েজ নয়| আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের হাতকে যেমনি ভাবে ঐ বুজুর্গদের রক্তারক্তি করা থেকে বাঁচিয়েছেন, তেমনিভাবে আমাদেরও উচিত, তাঁদের ব্যাপারে হক্ব করেছে কিনা ভুল করেছে সে ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে নিজেদের জিহ্বাকে রক্ষা করা| গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ যাবতীয় দলিল নিরীক্ষা করে ও ঘটনা পর্যবেক্ষন করে, ইমাম আলী সঠিক ছিলেন ও তাঁর বিরোধীরা ভুল করেছিল, বললেও এই বক্তব্য দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে 'হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, বিরোধী পক্ষের সাথে আলোচনা করার সুযোগ পেলে তাদেরকেও নিজের ইজতিহাদের যথার্থতা বুঝাতে সক্ষম হতেন' | যেমন, হযরত যুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু উষ্ট্রীর যুদ্ধে হযরত আলীর বিপক্ষে অবস্থান করা সত্ত্বেও, ঘটনার নিবিড় পর্যবেক্ষনের পরে নিজের ইজতিহাদকে পরিবর্তন করেছিলেন এবং যুদ্ধ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন|

এটাই হল, আহলে সুন্নাত আলেমদের মধ্য থেকে, যারা বিরোধীদের ব্যাপারে ভুল বলাকে জায়েজ মনে করে তাদের বক্তব্য| নতুবা, হযরত আলী ও তাঁর পক্ষে যারা ছিলেন শুধুমাত্র তাঁরা হক্কের উপর ছিলেন আর আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও তাঁর সাথে থাকা আসহাবে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন বাতিলের উপর ছিলেন বলা কোন ভাবেই জায়েজ নয়|

আসহাব-ই কিরামের মাঝের এই সংঘাত, আহকাম-ই শরইয়্যার একটি শাখার তথা ইজতিহাদের ভিন্নতার কারণে সংঘটিত হয়েছিল| তাঁদের মাঝে ইসলামের মূল ভিত্তি ও সুনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে কোন মতবিরোধ ছিল না| বর্তমানের কেউ কেউ, হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মত দ্বীনের বুজুর্গদের প্রতি কটাক্ষ করে, অসম্মান করে| অথচ আসহাব-ই কিরামকে হেয় করা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় করা বা কষ্ট দেয়ার কারণ তা বুঝতে পারেনা| ইমাম মালিক বিন আনাস তাঁর **শিফা-ই শরীফ** নামক কিতাবে বলেছেন, "মুয়াবিয়া অথবা আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে[12] যারা গালি দেয় বা কটাক্ষ করে, তারা নিজেরাই নিজেদের বুলির উপযুক্ত| তাঁদের সাথে যারা বেয়াদবী করে, তাঁদের বিরুদ্ধে যারা কটাক্ষ করে বা লিখে তাদেরকে শাস্তি দেয়া আবশ্যক"| মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের ক্বলবসমূহকে তাঁর হাবীবের আসহাবের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করুক| ঐ বুজুর্গদের যারা সালিহ ও মুত্তাকী তারাই ভালোবাসে| যারা মুনাফিক ও অপরাধী তারাই তাঁদেরকে ভালোবাসে না|

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝে তাঁদের প্রত্যেককে ভালোবেসে, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যারা তাঁদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করে, তাদেরকে **আহলে সুন্নাত** বলা হয়| যারা তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে ভালোবাসে আর অনেককে অপছন্দ করে, আর এভাবে তাঁদের অএককেই অসম্মান করে এবং যারা তাঁদের কারো পথেরই অনুসরণ করে না, তাদেরকে **রাফিজী** বা **শিয়া** বলা হয়| ইরান,

[12]হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, ৬০ হিজরীতে (৬৮০ খৃস্টাব্দে) শাম নগরীতে ইনতিকাল করেন|হযরত আমর ইবনি আস, ৪৩ হিজরীতে (৬৬৩ খৃস্টাব্দে) মিসরে ইনতিকাল করেন|

হিন্দুস্তান ও ইরাকে বহু রাফিজী আছে| তুরস্কে কোন রাফিজী নাই| এদের কেউ কেউ, মুসলমানদের খাঁটি আলাভীদের প্রতারিত করার জন্য নিজেদেরকে আলাভী বলে দাবী করে| অথচ আলাভী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসে এমন মুসলমানদের বলা হয়| কাউকে ভালোবাসার জন্য তার অনুসরণ করতে হয়, তার ভালোবাসার মানুষদের ভালোবাসতে হয়| এরা যদি প্রকৃতপক্ষেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসত, তবে তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করত| হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আসহাব-ই কিরামের প্রত্যেককেই ভালোবাসতেন | তিনি দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, দুঃখ-কষ্টের সঙ্গী ছিলেন| হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার থেকে হওয়া তাঁর মেয়ে হযরত উম্মু কুলসুমকে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিবাহ করেছেন| এক খুতবাতে তিনি হযরত মুয়াবিয়ার ব্যাপারে বলেছেন, 'আমাদের ভাইরা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন| তথাপি তারা কাফির বা ফাসিক নন| তাঁদের ইজতিহাদ তাদের এরূপ আচরণের কারণ'| হযরত মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হলে তিনি তাঁর চেহারায় লেগে থাকা মাটি নিজ হাতে মুছে দিয়েছেন, তাঁর জানাজার নামাজে নিজেই ইমামতি করেছেন| আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআন করীমে ইরশাদ করেছেন যে, "**মুমিনরা পরস্পরের ভাই**"|

সূরা ফাতিহ' এর সর্বশেষ আয়াত-ই করীমায়, "**আসহাব-ই কিরামগণ পরস্পরকে ভালোবাসতেন**" বলে ঘোষণা করা হয়েছে| আসহাব-ই কিরাম থেকে কোন একজনকেও অপছন্দ করা, কুরআন করীমকে অস্বীকার করার শামিল| আহলে সুন্নাত আলেমগণ, আসহাব-ই কিরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন'এর ফজিলতসমূহকে উত্তমভাবে অনুধাবন করেছেন| তাঁদের প্রত্যেককেই ভালোবাসার জন্য আদেশ দিয়েছেন| আর এভাবে মুসলমানদেরকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন|

আহলে বাইত অর্থাৎ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর সকল আওলাদকে, তাঁর বংশধরদেরকে যারা অপছন্দ করে, আহলে সুন্নাতের চোখের মনি তুল্য ঐ সকল বুজুর্গদের সাথে যারা দুশমনি করে,

তাদেরকে **খারেজী** বলা হয় | বর্তমানে খারেজীদেরকে **ইয়াজিদী** বলা হয়| ইয়াজিদীদের দ্বীন ও ঈমান ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

আসহাব-ই কিরামের প্রত্যেককে ভালোবাসি বলে দাবী করে কিন্তু তাঁদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ না করে, নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনাকে আসহাবের পথ হিসেবে উপস্থাপনকারীদের **ওয়াহাবী** বলা হয়| ওয়াহাবী মতবাদ, মাজহাবহীন দ্বীনী ব্যক্তি আহমাদ ইবনে তাইমিয়্যার কিতাবসমূহের ভ্রান্ত ফিকিরের সাথে, হ্যাম্ফার নামের ইংরেজ গোয়েন্দার মিথ্যা ব্যাখ্যার সংমিশ্রণে অর্জিত হয়েছে| ওয়াহাবীরা, আহলে সুন্নাত আলেমদের, তাসাওউফের অনুসারী বুজুর্গদের ও শিয়াদের অপছন্দ করে, প্রত্যেককেই মন্দ আখ্যা দেয়| কেবলমাত্র নিজেদেরকেই মুসলমান হিসেবে বিবেচনা করে| তাদের মতবাদের সাথে যাদের অমিল হয় তাদেরকে মুশরিক মনে করে| তাদের জান ও মালকে নিজেদের জন্য হালাল মনে করে| এজন্য তারা **ইবাহী** হিসেবে বিবেচিত হয়| নাস'সমূহ থেকে, অর্থাৎ কুরআন করীম ও হাদিস শরীফ থেকে ভুল ও নষ্ট অর্থ বের করে, এগুলিকেই ইসলাম বলে ধারণা করে| আদিল্লা-ই শরইয়্যা ও হাদিস শরীফের অধিকাংশকেই অস্বীকার করে| চার মাজহাবের আলেমগণ বহু কিতাবে দলীলসহ প্রমাণ করেছেন যে, আহলে সুন্নাত থেকে যারা আলাদা হয়, তারা দালালাতে নিমজ্জিত হয় ও ইসলামিয়্যাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধনের কারণ হয়| আরো বেশী জানার জন্য **কিয়ামত ও আখেরাত** এবং **সাআ'দাত-ই আবাদিয়্যা** কিতাবসমূহ পড়ুন, এছাড়াও আরবী ভাষার **মিনহাতুল ওহবীয়্যা**, **আত্তাওয়াস্সুল বিন্নবী ওয়া বিস্সালিহীন'**, **'সাবিলুন নাজাত'** এবং ফারসী ভাষার **সাইফুল আবরার** নামক কিতাবসমূহ পাঠ করুন| এই কিতাব সমূহসহ আহলে বিদায়াতের প্রতি রাদ্দিয়্যা হিসেবে লিখিত বহু মূল্যবান কিতাব, ইস্তানবুলের **হাক্বীকাত কিতাবেভীর** পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে| **হযরত ইবনে আবিদীন**'এর[13]রদ্দুল মুহতার এর তৃতীয় খণ্ডে বাগী'দের আলোচনায় ও **'নিয়ামতে ইসলাম'** কিতাবের নিকাহ অধ্যায়ে, ওয়াহাবীদের ইবাহী

[13]হযরত মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবিদীন ১২৫২ হিজরীতে (১৮৩৬ খৃস্টাব্দে) শামে ইনতিকাল করেন|

হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে লিখিত আছে| সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ খান' এর এডমিরালদের মধ্য থেকে আইয়্যুব সাবরী পাশা[14], **'মির'আতুল হারামাইন'** ও **'তারিখে ওহহাবিয়্যান'** নামক কিতাবে এবং আহমাদ যাওদাত পাশা, তারিখ কিতাবের সপ্তম খণ্ডে ওয়াহাবীদের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন| ইউসুফ নাবহানী'র মিশরে আরবী ভাষায় প্রকাশিত **শাওয়াহিদুল হক্ব** কিতাবেও ওয়াহাবী ও ইবনে তাইমিয়্যাহকে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হয়েছে| এই কিতাব থেকে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা, ১৯৭২ সালে ইস্তানবুলে আরবী ভাষায় আমাদের প্রকাশিত **ইসলামী আলেম ও ওয়াহাবীরা** নামক কিতাবে মওজুদ রয়েছে|

আইয়্যুব সাবরী পাশা রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা লিখেছেন: "ওয়াহাবী মতবাদ, ১২০৫ হিজরীতে (১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে) আরব উপদ্বীপে রক্তাক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক এক বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে"|

[14]আইয়্যুবসাবরীপাশা, ১৩০৮হিজরীতে (১৮৯০খৃস্টাব্দে) ইনতিকালকরেছেন।